

উসূলে ফিক্বহ  
ফিক্বহের মূলনীতি

মূল : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন

অনুবাদক : মোঃ হযরত আলী

সম্পাদনায়: মোজাফ্ফার বিন মুকসেদ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر : مكتبة السنة  
 كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.  
 Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ  
 কাটাখালী, রাজশাহী।  
 মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৮ ঈসাবী

বিনিময় মূল্য: ১২০ টাকা

## সূচিপত্র

ক্রমিক	الموضوع	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	كلمة الناشر	প্রকাশকের কথা	০৪
২.	كلمة المترجم	অনুবাদকের কথা	০৫
৩.	مقدمة المؤلف	লেখকের ভূমিকা	০৮
৪.	أصول الفقه	উসূলুল ফিকহ	১১
৫.	الأحكام	শারঈ বিধি-বিধান	১৫
৬.	العلم	ইলম	২৪
৭.	الكلام	বাক্য	২৭
৮.	الأمر	আদেশ	৩৯
৯.	النهي	নিষেধ	৪৬
১০.	العام	ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ	৫৪
১১.	خاص	নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ।	৬১
১২.	المطلق المقيد	শর্তহীন ও শর্তযুক্ত	৬৯
১৩.	المجمل المبين	ব্যাখ্যাহীন ও ব্যাখ্যাকৃত	৭১
১৪.	الظاهر والمؤول	জাহের ও মুআওয়াল	৭৭
১৫.	النسخ	রহিতকরণ	৮০
১৬.	الأخبار	খবর সমূহ	৮৮
১৭.	الإجماع	ইজমা	৯৬
১৮.	القياس	ক্বিয়াস	১০০
১৯.	التعارض	দলীলে মাবে পারস্পরিক বিরোধ	১০৯
২০.	الترتيب بين الأدلة	দলীলের মাবে স্তর বিন্যাস	১১৭
২১.	المفتي والمستفتي	ফাতাওয়া প্রার্থী ও ফাতাওয়া প্রদানকারী	১১৮
২২.	الاجتهاد	ইজতেহাদ	১২০
২৩.	التقليد	তাক্বলীদ	১২১
২৪.	المراجع	গ্রন্থপঞ্জী	১২৬
২৫.	মাকতাবাতুস সুনাহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইয়ের তালিকা		১২৭

## প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদাতের যোগ্য কেউ নেই, তিনি অদ্বিতীয়, তার কোন শরীকও নেই। আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং তার প্রেরিত রসূল।

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় গ্রন্থে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি আমাদেরকে জামা‘আত বদ্ধ থাকতে ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। দলাদলি ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (আল্লাহর দীন ও কিতাবুল্লাহ) আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (সূরা আল ইমরান ৩ঃ ১০৩)। তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেছে। আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা আন‘আম ৬ঃ ১৫৯)।

অথচ মুসলিমরা আজ যেন ৭৩ দলে, মতে বিভক্ত। আর বিভক্তির প্রধান দু’টি কারণ হচ্ছে আক্বীদা ও ফিক্বহী মাসায়েলে। মাকতাবাতুস সুন্নাহ এ দু’টি বিষয়কে সামনে রেখে কাজ করে চলছে। মুজতাহিদ ইমাম শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন ফিক্বহের মূলনীতির উপর ‘আল উসূল মিন ইলমিল উসূল’ কিতাবটি রচনা করেন। বইটির সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছি উসূলে ফিক্বহ বা ফিক্বহের মূলনীতি। আল্লাহ তুমি আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

প্রকাশক

ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ

পরিচালক, মাকতাবাতুস সুন্নাহ। মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

## অনুবাদের কথা

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا نعلم بما يحب ويرضى. والصلاة والسلام على على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا إلى صراط مستقيم. وهو الذي نلتبس فلاح حياتنا الدنيا والآخرة في اتباع سننه. فإنه لا سبيل إلى الفوز والفلاح إلا في اتباع آثاره المباركة. والسلام على من تبع محمدا صلى الله عليه وسلم من حينه إلى يوم الساعة. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا منهم بمنه ورحمته. إنه هو المستجيب لدعوة الداعين الغفور لعباده المستغفرين. أما بعد.

সমস্ত প্রসংশা দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার জন্য। যিনি মেহেরবানী করে আমাদেরকে ঈমানের মত অমূল্য সম্পদ দান করে আমাদের ধন্য করেছেন। আজীবন প্রসংশা করে যার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। দরুদ ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মহান অগ্রদূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। যার জীবন ধারা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে আমরা একান্তভাবে অভিলাষী-প্রয়াসী। তার সুমহান জীবন চরিতকে ঘিরেই আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম তৎপরতা আবর্তিত হয়। শান্তি বর্ষিত হোক সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাদ্দীন দের প্রতি। যারা জীবন বাজি রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহবানে সাড়া দিয়েছেন। তার মিশনকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার আমাদেরকে কবুল করুন। কিয়ামতের দিন তাদের কাঁতারে শামিল করুন। আমিন!

অতঃপর মহান রবের আবারো শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার মতো এক নগন্য ব্যক্তিকে তার মহান দ্বীনের কিছু খেদমাতের ধারায় যুক্ত করেছেন। দয়ালু আল্লাহ এ নগন্যকে সৌদি আরবের একজন সর্বজন মাননীয় ব্যক্তিত্ব শাইখ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমিন রচিত 'আল উসূল মিন ইলমিল উসূল' নামক কিতাবের অনুবাদ ও প্রয়োজনীয় টিকা সংযোজনের তাওফিক দিয়েছেন। শাইখের উক্ত কিতাবটি উসূলে ফিকহ বা ইসলামী প্রায়োগিক শাস্ত্র বিষয়ক মূলনীতি সম্পর্কিত একটি সুসমন্বিত কিতাব। তিনি কিতাবটিতে উসূলে ফিকাহ মৌলিক নিয়ম-নীতি গুলো অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন। আসলে শাইখ সালেহ আল উসাইমিন মানেই রাজা-প্রজা, ছোট-বড় নির্বিশেষে সর্বজন শ্রদ্ধীয় এক মহান ব্যক্তিত্ব। কাজেই

তাকে ও তার লেখনীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার অবকাশ রাখে না। যাহোক সন্মানিত শাইখের কিতাবটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে খোদ সৌদি আরবের কিছু ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে এটি সিলেবাসভুক্ত হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় আমাদের কওমী মাদরাসা গুলোতেও কিতাবটি সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। কিতাবটি আমাদের মাদরাসাতে সিলেবাস ভুক্ত রয়েছে। এটি পড়াতে গিয়ে আমার ছাত্রসহ অনেকেই কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ করার পরামর্শ দেন। অতঃপর মাকতাবাতুস সুন্নাহর সত্ত্বাধিকারী ডাক্তার মোশাররফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করলে, তিনি উৎসাহ প্রদান করেন। সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর ফযলে কিতাবটি প্রকাশ পায়। আলহামদু লিল্লাহ।

কিতাবটি খোদ সৌদি আরবেই মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য সিলেবাস হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে মাদরাসা গুলোতে এই কিতাবটি যারা পড়েন, তারা এই বিষয়ে একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের বলা যায়। সেদিকটি বিবেচনা করে, অনুবাদ কর্মটি আক্ষরিক অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মধ্যবর্তী পস্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি। কেননা শ্রেফ আক্ষরিক অনুবাদ করলে বাংলা ভাষাগত মান ঠিক থাকে না। আবার নিছক ভাবানুবাদ করলেও তার সাথে আরবি ইবারতের সামঞ্জস্য খুঁজে পেতে তুলনামূলক দুর্বল ছাত্রদের জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। এজন্য কিতাবটি সর্বজন উপযোগী করার জন্য ভাষাগত ক্ষেত্রে মধ্যম পস্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করেছি।

উসূলে ফিকাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক বিষয় হলেও আমাদের মাদরাসা গুলোতে এর তেমন দারস-তাদরীস ছিল না। বর্তমানে অবশ্য প্রায় সব মাদরাসাতেই এর পঠন-পাঠন চলছে। কিছু বিদ্বান জুমহুর বিদ্বানের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই ইলমকে ‘হাদীস কাঁটার কাঁচি’ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে আমরা জুমহুরদের কর্মপস্থা অবলম্বন করে টেবিলটা উল্টিয়ে দিয়ে ইলমে হাদীসকে ডিফেন্ড করতে পারি। বস্তুত ফিকহুল হাদীস বা হাদীসের বুঝ নির্ভর করে উসূলে ফিকাহর উপর। আমাদের সালাফ আলেমদের কিতাব অধ্যয়ন করলে প্রতিয়মান হয় যে, এই ইলমে তাদের বিচরন ছিল অবাধ।

অনুবাদ কর্মটি সম্পন্ন করতে যারা আমাকে পদে পদে প্রেরণা যুগিয়েছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমার ছাত্র আল আমিন ও যুবাইর অত্যন্ত কষ্ট করে টাইপ কাজে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহ তা‘য়ালা এদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করুন।

অনুবাদের ভাবোদ্ধারে আশা করি বড় ধরনের ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হবে না। তবে কিতাবটির অনুবাদ কর্ম খুব স্বল্প সময়ে করা হয়েছে। এই জন্য এখানে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ভুল থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে সহৃদয় পাঠকদের মূল্যবান মতামত, পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস গুলো কবুল ও মঞ্জুর করুন এবং একে আমাদের পরকালের নাজাতের উসিলা করুন। আমীন।।

বিনীত

মোঃ হযরত আলী

দাওরা হাদীস, মাদরাসা দারুল হাদীস, পাবনা।

অনার্স ও মাস্টার্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

শিক্ষক, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট

দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা।

মোবাইল: ০১৭৮০-৪২৭২৩২

## লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি। তার কাছে সাহায্য চাই। তার কাছে ক্ষমা চাই। তার নিকটে তাওবা করি।<sup>১</sup> আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে আমাদের আত্মার অনিষ্ট<sup>২</sup> থেকে এবং আমাদের মন্দ কর্ম<sup>৩</sup> থেকে। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ হেদায়েত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আমি আরোও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল। আল্লাহ রহমত করুন তার উপর, তার পরিবার-পরিজনের<sup>৪</sup> উপর, তার ছাহাবীদের উপর এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যারা ন্যায় সঙ্গতভাবে তাদের অনুসরণ করবে<sup>৫</sup> তাদের উপর। তিনি তাদের উপর অবিরত শান্তির ধারা বর্ষণ করুন।

১. তাওবা হলো: পাপ থেকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা। এটা দু'প্রকার। যথা: التوبة المطلقة এবং التوبة المقيدة।

২. অনিষ্ট হলো নির্দিষ্ট কোন পাপের নয়, বরং সাধারণভাবে সব ধরনের পাপের জন্য যে তাওবা করা হয়।

৩. তوبة المقيدة হলো: ঐ তাওবা যা নির্দিষ্ট পাপের জন্য করা হয়।

৪. এখানে আত্মার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কেননা, নিশ্চয় আত্মার অনিষ্টতা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ... إن النفس لأماراة بالسوء ... নিশ্চয় আত্মা মন্দ কর্মের নির্দেশ দেয় ... (সূরা ইউসুফ '১২:৫৩)।

৫. অন্তরের অনিষ্টতা সব সময় দু'টি জিনিসের উপর আবর্তিত হয়।

(ক). পাপ কাজের দিকে ধাবিত করা। (খ). সৎ কর্ম থেকে বিরত রাখা।

৬. এখানে آل অর্থ: তার নিকটাত্মীয়ের মাঝে যারা মু'মিন এবং মু'মিন নয়, তারা آل কিনা এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। جلاء الأفهام পৃ: ৩২৩, القول البدیع, ৮৮।

৭. ছাহাবীদের অনুসরণ করার দিক দিয়ে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(ক). যারা তাদের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(খ). যারা তাদের যথাযথভাবে অনুসরণ করেন।

(গ). যারা তাদের ত্রুটিপূর্ণভাবে অনুসরণ করেন।

আমরা সাধারণত দ্বিতীয় শ্রেণী মানুষের জন্য দু'আ করি। প্রথম শ্রেণীর মানুষ দু'আর মোটেও উপযুক্ত নয়। আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ তাদের অনুসরণের মাত্রা অনুযায়ী দু'আর অন্তর্ভুক্ত হবেন।



অতঃপর এটি ফিকহ বা প্রায়োগিক শাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা। ‘মা’হাদুল ইলমিয়াহ’<sup>৬</sup> এর মাধ্যমিক স্তরের তৃতীয় বর্ষের উপযোগী করে এটি আমি লিপিবদ্ধ করেছি। এবং নাম দিয়েছি-

الأصول من علم الأصول (ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি)

আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন আমাদের কর্মগুলোকে তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ করেন, তার বান্দাদের জন্য উপকারী করেন। নিশ্চয়ই তিনি সন্নিহিতে, প্রার্থনা মঞ্জুরকারী।

লেখক: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন

---

৬. উক্ত প্রতিষ্ঠানে লেখক শিক্ষকতা করেছেন।



## উসূলে ফিক্বহ - أصول الفقه

সংজ্ঞা: أصول الفقه কথাটি দু'দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। প্রথমত: শব্দ দু'টি এককভাবে। অর্থাৎ أصول এবং الفقه এর শাব্দিক পরিচিতি।

الأصول শব্দটি أصل এর বহুবচন। আর أصل বলা হয়, যার উপর অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই দেওয়ালের মূল ভিত্তিকে أصل الجدار বলা হয়। আরো বলা হয়, أصل الشجرة বা বৃক্ষমূল, যা থেকে ডাল-পালা বিস্তার লাভ করে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

অর্থ: “তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? উত্তম বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত (সূরা ইবরাহীম ১৪:২৪)।”

الفقه এর আভিধানিক অর্থ: বুঝা, অনুধাবন করা। এ অর্থেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَأَحْلَلْ غُدَّةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

“আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে (সূরা ত্বা-হা ২০:২৭)।”

পারিভাষিক অর্থ:

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

“ফিক্বহ হলো বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদীর মাধ্যমে শরীয়াতের কর্মগত বিধি-বিধানগুলো জানা।”

সুতরাং আমাদের কথা: معرفة (জানা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিশ্চিত জানা, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে জানা। কেননা, ফিক্বহী বিধি-বিধানগুলো জানা কোন সময় নিশ্চিতভাবে হয়, আবার কোন সময় প্রবল ধারণামূলক হয়। যেমনটা ফিক্বহের অনেক মাসআ'লার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আমাদের কথা: الأحكام الشرعية (শারঈ আহকাম) এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শরীয়াত থেকে প্রাপ্ত বিধি-বিধান। যেমন: ওয়াজিব, হারাম ইত্যাদি।

সুতরাং এর দ্বারা জ্ঞান ভিত্তিক বিধি-বিধান বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন: এটা জানা যে, “পূর্ণ আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর।” এবং অভ্যাসগত বা প্রাকৃতিক বিধি-বিধানও বের হয়ে গিয়েছে। যেমন: শীতের রাতে যখন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকে, তখন শিশির পড়ার বিষয়টি জানা।

المعملة (কর্মগত) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা আক্বিদার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়। যেমন: ছালাত, যাকাত ইত্যাদি।

সুতরাং এর দ্বারা আক্বিদার সাথে সংশ্লিষ্ট বিলুপ্ত হয়েছে। যেমন: আল্লাহর একত্ববাদ, তার নামসমূহ, গুণাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে জানা। সুতরাং এগুলিকে পারিভাষিক ক্ষেত্রে ফিকুহ হিসাবে অভিহিত করা হবে না।<sup>৭</sup>

بأدلتها التفصيلية (শারঈ বিস্তারিত দলীল) এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফিকুহের বিস্তারিত মাসআলাসমূহের সাথে যুক্ত ফিকুহের দলীলসমূহ।

সুতরাং এর দ্বারা أصول الفقه বের হয়ে গিয়েছে। কেননা, أصول الفقه এর ক্ষেত্রে ফিকুহের সংক্ষিপ্ত দলীলসমূহ আলোচিত হয়।

দ্বিতীয়ত: একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের নাম হওয়ার দিক দিয়ে উসূলে ফিকুহের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। সুতরাং এর সংজ্ঞা হলো:

৭. অনেক উসূলবিদ ফিকুহ এর সংজ্ঞায় المعملة (কর্মগত) শব্দের স্থলে الفرعية (শাখাগত) শব্দ বলেছেন। সুতরাং তাদের নিকট ফিকুহ এর সংজ্ঞা হলো,

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ بِأَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

“ ফিকুহ হলো বিস্তারিত দলীল-প্রমাণাদীর মাধ্যমে শরীয়াতের শাখাগত বিধি-বিধানগুলো জানা। ”

সম্মানিত লেখক এখানে ফিকুহের সংজ্ঞায় শাখাগত বিধান না বলে কর্মগত বিধান বলেছেন। কারণ শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহি. শরীয়াতের বিধি-বিধানকে মৌলিক ও শাখাগত এভাবে ভাগ করাকে নাকচ করেছেন। তিনি বলেন, এভাবে ভাগ করা বিদআত। আল্লাহ ও তার রসূলের কথায় এর কোন ভিত্তি নেই। কারণ এতে ছালাতকে শাখাগত বিষয় হিসাবে অভিহিত করা হয়। অথচ এটি দীনের চূড়ান্ত পর্যায়ের মৌলিক বিষয়! সুতরাং এ বিভাজন কে নিয়ে আসলো? বস্তুত এ বিভাজন নিয়ে এসেছে মু'তাজিলা, জাহমিয়া ও অন্যান্য বিদআতী দলের লোকেরা। (মাজমুউল ফাতওয়া ১৯/২০৭-২১০)

عَلَّمَ يَحْتَ عَنْ أَدْلَةِ الْفَقْهِ الْإِجْمَالِيَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الْإِسْتِفَادِ مِنْهَا وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ.

“উসূলে ফিক্বহ এমন জ্ঞান বা বিদ্যা, যা ফিক্বহের সংক্ষিপ্ত দলীল, তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি ও উপকার লাভকারী তথা মুজতাহিদ ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে।”

আমাদের কথা: الإجمالية (সংক্ষিপ্ত দলীল) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো القواعد العامة বা সাধারণ/ব্যাপক নিয়ম-নীতি। যেমন: উসূলবিদদের কথা ‘নির্দেশ’ ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দেয়। ‘নিষেধ’ হারাম হওয়ার ফায়দা দেয়। ‘শুদ্ধতা’ বাস্তবায়নের দাবি করে।<sup>৮</sup>

এর দ্বারা বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ বের হয়ে গিয়েছে। অতএব, বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের আলোচনা উসূলে ফিক্বহে উল্লেখিত হবে না। তবে শুধুমাত্র নিয়ম-নীতির উদাহরণ হিসাবে এ নিয়ে আলোচনা হবে।

আমাদের কথা: وكيفية الاستفادة منها (তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি) এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শব্দের মর্মার্থ ও তার বিধি-বিধান তথা عموم (ব্যাপক অর্থ প্রদান করা) نسخ (শর্তযুক্ত হওয়া) تقييد (শর্তহীন হওয়া) إطلاق (নির্দিষ্ট হওয়া) خصوص (রহিতকারী) منسوخ (রহিত) ইত্যাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে দলীলসমূহ থেকে শারঈ বিধি-বিধান কিভাবে পাওয়া যায়, তা অবগত হওয়া। নিশ্চয় এটি জানার মাধ্যমেই ফিক্বহের দলীলসমূহ থেকে তার বিধি-বিধান পাওয়া যাবে।

আমাদের কথা: وحال المستفيد (উপকার লাভকারীর অবস্থা) এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকার লাভকারী ব্যক্তির অবস্থা জানা। আর উপকার লাভকারী ব্যক্তি হলেন মুজতাহিদ। তাকে مستفيد নামে নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু তিনি ইজতেহাদের স্তরে পৌঁছার কারণে নিজেই দলীলসমূহ থেকে বিধি-বিধানগুলো লাভ করেন। সুতরাং মুজতাহিদের পরিচয়, ইজতেহাদের শর্ত, হুকুম ইত্যাদি বিষয় উসূলে ফিক্বহে আলোচনা করা হয়।

৮. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

## উসূলে ফিক্‌হের উপকারিতা:

উসূলে ফিক্‌হ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন একটি এলেম যা প্রচুর উপকারী। এর উপকারিতা হলো এমন সক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করা, যার দ্বারা দলীলসমূহ থেকে শারঈ বিধি-বিধান নিরাপদে বের করা যায়।

সর্বপ্রথম এ ইলম একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরীস আশ শাফে'ঈ রহি.।<sup>৯</sup>

অতঃপর অনেক আলিম এ ব্যাপারে তার অনুসরণ করেন এবং গদ্য-পদ্য, সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত বিভিন্ন ধরনের কিতাব রচনা করেন। আর এভাবেই ‘উসূলে ফিক্‌হ’ অনন্য বৈশিষ্ট্য ও অবকাঠামোর অধিকারী একটি স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

---

৯. উসূলে ফিক্‌হ বিষয়ে প্রথম কে কিতাব রচনা করেছেন, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল, ফখরুদ্দিন রাযী, ইবনে খালদুন, বদরুদ্দিন যুরকাশী, জুআইনী, আল্লামা সুবকী, ইবনু খাল্লিকান সহ অধিকাংশ বিদ্বানের মতানুসারে এ বিষয়ে প্রথম কিতাব রচনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী র.। তাঁর কিতাবের নাম ‘আর রিসালাহ’। (আল ইবহাজ ফী শরহিল মিনহাজ, আত তামহীদ ফী তাখরীজিল উসূল আলাল ফুর’ প্রভৃতি।) কিছু হানাফী আলেম দাবী করেন যে, ইমাম আবু হানিফা র. প্রথম এ বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। আবার কেউ বলেন, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ প্রথম কিতাব লিখেছেন। কিছু শীআ দাবী করে যে, তাদের ইমাম মুহাম্মদ বাকের আলী বিন যাইনুল আবেদীন প্রথম কিতাব লিখেছেন। কিন্তু এ সব দাবীর পক্ষে তেমন কোন দলীল প্রমাণ নেই। এবং এদের কোন কিতাবের সন্ধানও পাওয়া যায় না। এ জন্য কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানরাও দাবী করে যে, তারাই এ বিষয়ে প্রথম কিতাব লিখেছে, তবুও তাতে অবাধ হওয়ার কিছু থাকবে না।

## আহকাম বা শারঈ বিধি-বিধান (الأحكام)

শব্দটি حكم এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ফায়ছালা করা।

পারিভাষিক অর্থ:

ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع.

“মুকাল্লাফ (যাদের উপর শরীয়াতের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়) এমন ব্যক্তির কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট শরীয়াতের খেতাব (কুরআন ও হাদীছ) যে তলব (কোন কাজ করা অথবা না করার দাবী), তাখযীর (কোন কাজ করা বা না করার জন্য ঐচ্ছিকতা প্রদান) অথবা প্রতীকী বিধান যা কিছু দাবী করে, তাকে আহকাম বলে।”

خطاب الشرع (শরীয়াতের খেতাব বা সম্বোধন) এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সুন্নাহ।<sup>১০</sup>

المكلفين (মুকাল্লাফ ব্যক্তির কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট) এ অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যা তাদের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট; সেটা কথা হোক অথবা কর্ম, করণীয় হোক অথবা বর্জনীয় হোক। সুতরাং উক্ত বক্তব্য দ্বারা আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয় বের হয়ে গেছে। অতএব, এ পরিভাষা অনুসারে আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে ‘হুকুম’ হিসাবে অভিহিত করা হবে না।

আমাদের বক্তব্য: المكلفين (শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যাদের বৈশিষ্ট্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া এ কথা দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। সুতরাং এটি শিশু ও পাগলকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

আমাদের বক্তব্য: من طلب (কোন তলব) এ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আদেশ ও নিষেধ। চাই তা আবশ্যিকতার ভিত্তিতে হোক অথবা উত্তমতার ভিত্তিতে হোক।<sup>১১</sup>

১০. যেহেতু কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমেই শরীয়ত প্রণেতা আমাদেরকে বিভিন্ন কর্মের নির্দেশনা প্রদান করার জন্য সম্বোধন করেন, এ জন্য কুরআন ও হাদীছকে খেতাব বা সম্বোধনের মাধ্যম হিসাবে অভিহিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইজমা ও ক্বিয়াসকে খেতাব বলা হয় না। কেননা, এগুলির মাধ্যমে শরীয়ত প্রণেতা আমাদেরকে সম্বোধন করেন না। এগুলি মূলতঃ কুরআন-সুন্নাহ উৎসারিত প্রশাখাগত দলীল।

১১. তলব অর্থ চাওয়া, দাবী করা প্রভৃতি। উসূলে ফিকুহ শাস্ত্রে তলব বলতে শারঈ আদেশ ও নিষেধ বুঝায়। অর্থাৎ কোন কাজ করা বা না করার দাবীকেই তলব বলে।

আমাদের বক্তব্য: أو نخير (ঐচ্ছিকতা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুবাহ বা বৈধ বিষয়।<sup>১২</sup>

আমাদের বক্তব্য: أو وضع (প্রতীকী বিধান) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধ, অশুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় যেগুলিকে শরীয়ত প্রণেতা কোন কাজ বাস্তবায়ন করা অথবা বাতিল করে দেয়ার বিশেষণ ও প্রতীক হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

## শারঈ আহকাম বা বিধি-বিধানের প্রকারভেদ (أقسام الأحكام الشرعية):

শারঈ আহকাম দু'ভাগে বিভক্ত:

(ক) الأحكام التكليفية - দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান

(খ) الأحكام الوضعية - প্রতীকী বিধি-বিধান।

(ক) الأحكام التكليفية - দায়িত্বমূলক বিধি-বিধান পাঁচ প্রকার:

১. ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় বিধান)।

২. মানদুব (পালন বাঞ্ছনীয়)।

৩. হারাম (পালন করা নিষিদ্ধ)

৪. মাকরুহ (পালন নিন্দনীয়)

৫. মোবাহ (পালন বৈধ)<sup>১৩</sup>

১. ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয় বিধান): ওয়াজিবের আভিধানিক অর্থ বিচ্যুত, পতিত, আবশ্যকীয়।

---

১২. শরীয়ত প্রণেতা কর্তৃক কোন কাজ করা বা না করার ঐচ্ছিকতা প্রদানকে তাখযীর বলে। যেমন: সফরে ছিয়াম পালন করা।

১৩. শরীয়ত প্রণেতা আমাদেরকে যে সব কর্ম আবশ্যিকতার ভিত্তিতে পালন করতে বলেন সেটি ওয়াজিব, যা উত্তমতা বা ঐচ্ছিকতার ভিত্তিতে বলেন, সেটি মানদুব বিবেচিত হয়। অপরদিকে যে সব কর্ম আবশ্যিকতার ভিত্তিতে পালন করতে নিষেধ করেন সেটি হারাম, যা সাধারণ ভাবে নিষেধ করেন, সেটি মাকরুহ বিবেচিত হয়। আর যে সব কর্মের সাথে কোন আদেশ-নিষেধ থাকে না, তাকে বলা হয় মোবাহ।



পারিভাষিক অর্থ:

ما أمر به الشارع على وجه الإلزام.

“শরীয়ত প্রণেতা আবশ্যিকতার ভিত্তিতে যা পালনের আদেশ করেন, তাকে ওয়াজিব বলে।” যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত।

আমাদের বক্তব্য: ما أمر به الشارع (শরীয়ত প্রণেতা যা আদেশ করেন) এ শব্দ দ্বারা হারাম, মাকরুহ ও মোবাহ বিষয় বিলুপ্ত হয়েছে।<sup>১৪</sup>

আমাদের বক্তব্য: على وجه الإلزام (আবশ্যিকতার ভিত্তিতে পালনের) এ শব্দ দ্বারা ওয়াজিব মানদুব বিলুপ্ত হয়েছে।<sup>১৫</sup> ওয়াজিব কর্ম আনুগত্যের ভিত্তিতে পালনকারী ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে এবং বর্জনকারী হবে শাস্তির যোগ্য। এটিকে ফরজ, ফারিজা, হাতমুন, লাযেম প্রভৃতিতে অভিহিত করা হয়।<sup>১৬</sup>

২. মানদুব (পালন বাঞ্ছনীয়)। আভিধানিকভাবে মানদুব অর্থ আহত, কাজিত, বাঞ্ছনীয়। পারিভাষিক অর্থ:

ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام.

“সাধারণভাবে শরীয়ত প্রণেতা যে সব বিষয়ে আদেশ করেন যা আবশ্যিকতার ভিত্তিতে পালন বুঝায় না তাকে মানদুব বলে।” যেমন: নিয়মিত প্রত্যহ পালনীয় সুন্নাত সমূহ।

১৪. ما أمر به الشارع (শরীয়ত প্রণেতা যা আদেশ করেন) এ কথা দ্বারা হারাম, মাকরুহ ও মোবাহ বিষয় বের হয়ে গেছে। হারাম ও মাকরুহ বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হলো হারাম ও মাকরুহ এর ক্ষেত্রে আদেশ করা হয় না। বরং নিষেধ করা হয়। মোবাহ বের হয়ে যাওয়ার কারণ হলো, এতে কোন আদেশ থাকে না।

১৫. মানদুব বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হলো, এখানে আদেশ থাকলেও আবশ্যিকভাবে পালনের আদেশ থাকে না।

১৬. অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, ওয়াজিব ও ফরজ একই বিষয়। কিন্তু হানাফীদের নিকট ফরজ হলো যা অকাউত দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। যেমন: কুরআন বা মুতাওয়াতিহ হাদীছের মাধ্যমে সাব্যস্ত আবশ্যিক পালনীয় কর্ম। পক্ষান্তরে দলীলে যন্নী বা প্রবল ধারণা ভিত্তিক দলীল অর্থাৎ খবরে ওয়াহেদ এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলে, তা ওয়াজিব গণ্য হবে। অনুরূপভাবে দলীলে ক্বাতঈ বা অকাউত দলীলের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হলে হারাম আর দালীলে যন্নীর মাধ্যমে সাব্যস্ত হলে নিষেধাজ্ঞা মাকরুহ গণ্য হবে।

আমাদের বক্তব্য: ما أمر به الشارع (শরীয়ত প্রণেতা যা আদেশ করেন) এ কথা দ্বারা হারাম, মাকরুহ ও মোবাহ বিষয় মানদুব থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য: لا على وجه الإلزام (আবশ্যিকতার ভিত্তিতে পালন নয়) এ কথা দ্বারা ওয়াজিব বের হয়ে গেছে।

মানদুব কর্ম আনুগত্যের ভিত্তিতে পালনের জন্য কর্তা ছাওয়াবের অধিকারী হবে। তবে পরিত্যাগকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না। একে সুন্নাত, মাসনুন, মুস্তাহাব, নফল প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

৩. হারাম (পালন করা নিষিদ্ধ)।

হারাম শব্দের আভিধানিক অর্থ বারণকৃত, নিষিদ্ধ।

পারিভাষিক অর্থ:

ما فهمى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك.

“আবশ্যিকতার ভিত্তিতে পালন ছেড়ে দেয়ার জন্য শরীয়ত প্রণেতা যা নিষেধ করেন, তাকে হারাম বলে।” যেমন: পিতা-মাতার অবাধ্য আচরণ।

আমাদের বক্তব্য: ما فهمى عنه الشارع (শরীয়ত প্রণেতা যা নিষেধ করেন) এ কথা দ্বারা ওয়াজিব, মানদুব ও মোবাহ বের হয়ে গেছে।

হারাম কাজ আনুগত্যের ভিত্তিতে বর্জনকারী ছাওয়াব পাবে এবং তা পালনকারী শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হবে। এটাকে মাহযুর (পরিত্যক্ত, নিষিদ্ধ) ও মামনূ (নিষিদ্ধ) বলা হয়।

৪. মাকরুহ (পালন নিন্দনীয়)।

মাকরুহ শব্দের আভিধানিক অর্থ: ঘৃণিত, নিন্দনীয়, অপছন্দনীয়। পরিভাষায়:

ما فهمى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك.

“শরীয়ত প্রণেতা যা সাধারণভাবে কোন কিছু করতে নিষেধ করেন, আবশ্যিক ভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য নয়, তাকে মাকরুহ বলে।” যেমন: বাম হাত দ্বারা লেন-দেন করা।

আমাদের বক্তব্য: ما نهي عنه الشارع (শরীয়ত প্রণেতা যা নিষেধ করেন) এ কথা দ্বারা ওয়াজিব, মানদুব ও মোবাহ বিলুপ্ত হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য: (আবশ্যিক ভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য নয়) এ কথা দ্বারা হারাম বের হয়ে গেছে। মাকরুহ কাজ আনুগত্যের ভিত্তিতে বর্জনকারী ছাওয়াব পাবে এবং তা পালনকারীকে শাস্তি দেয়া হবে না।

৫. মোবাহ (পালন করা বৈধ)। মোবাহ শব্দের আভিধানিক অর্থ ঘোষিত, অনুমোদিত। পারিভাষিক অর্থ:

ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته.

“যে কর্মের সত্তার সাথে কোন আদেশ বা নিষেধ সংশ্লিষ্ট থাকে না, তাকে মোবাহ বলে।” যেমন: রমাদনের রাতে খাবার খাওয়া।

আমাদের বক্তব্য: ما لا يتعلق به أمر (যার সাথে কোন আদেশ সংশ্লিষ্ট থাকে না) এ কথা দ্বারা ওয়াজিব ও মানদুব বের হয়ে গেছে।

ولا نهي (এবং নিষেধ ও নয়) এ শব্দ দ্বারা হারাম ও মাকরুহ বের হয়ে গেছে।

لذاته (সত্তার সাথে) এ শব্দ দ্বারা বের হয়ে গেছে ঐ সব বিষয়, যেগুলির সাথে ‘আদেশ’ যুক্ত হয়েছে, কোন আদিষ্ট বিষয়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে অথবা যেগুলির সাথে ‘নিষেধ’ যুক্ত হয়েছে, কোন নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হওয়ার কারণে। কেননা, এগুলি কোন আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ বিষয় যারই মাধ্যম হবে, তার হুকুমই এদের হুকুম হিসাবে গণ্য হবে।<sup>১৭</sup> এটি বিষয়টিকে তার মৌলিক বৈধতা থেকে বের করে দিবে না।<sup>১৮</sup>

১৭. কোন মোবাহ কর্ম ওয়াজিব কর্মের মাধ্যম হওয়ার কারণে ওয়াজিব হওয়ার উদাহরণ হলো ছালাত আদায়ের জন্য ওয়ু করা ফরয। পানি ক্রয় মোবাহ। কিন্তু কোথায় যদি পানি ক্রয় করা ছাড়া ওয়ুর পানি না পাওয়া যায়, এবং কাছে টাকাও থাকে, তাহলে সেই সময় পানি ক্রয় করা ফরজ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কোন মোবাহ কাজ হারাম কাজের মাধ্যম হলে, মোবাহ কাজটিও হারাম গণ্য হবে।

১৮. অর্থাৎ বিষয়টি মৌলিক ভাবে বৈধই থেকে যাবে। যদিও সেটি কোন কোন ক্ষেত্রে আদিষ্ট বিষয়ের মাধ্যম হওয়ার কারণে আদিষ্ট অথবা নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ বিবেচিত হয়।

মোবাহ বিষয় যতক্ষণ পর্যন্ত বৈধতার বিশেষণের উপর বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কোন ছাওয়াব বা শাস্তি কোন কিছুই ধার্য হবে না। এটিকে হালাল বা জায়েয হিসাবে অভিহিত করা হয়।

## (খ) الأحكام الوضعية প্রতীকী বিধি-বিধান।

প্রতীকী বিধি-বিধান এর পারিভাষিক অর্থ:

ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء.

“যাকে শরীয়ত প্রণেতা কোন কিছু সাব্যস্ত হওয়া বা না হওয়া অথবা কোন কিছু বাস্তবায়িত হওয়া বা না হওয়ার প্রতীক নির্ধারণ করেছেন, তাকে প্রতীকী বিধি-বিধান বলে।” এর অন্যতম হলো- ছহীহ-শুদ্ধ হওয়া, ফাসেদ-নষ্ট হওয়া।<sup>১৯</sup>

### ১। ছহীহ (শুদ্ধ)

ছহীহ এর আভিধানিক অর্থ: রোগ থেকে মুক্ত বা নিরাপদ।

পারিভাষিক অর্থ:

“যার কর্মের ফল ধার্য হয়, চাই সে কর্ম কোন ইবাদত হোক অথবা লেন-দেন বা চুক্তিমূলক হোক।”

ইবাদতের ক্ষেত্রে ছহীহ হলো, যে কর্মের দ্বারা ব্যক্তি দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায় এবং দাবী পূরণ হয়।<sup>২০</sup>

লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে ছহীহ হলো যে কর্ম তার ফলাফলের অস্তিত্ব ধার্য করে। যেমন: ক্রয়-বিক্রয় কর্মের উপর ফলাফল হিসাবে বিক্রেতার জন্য পণ্যের মালিকানা ধার্য হওয়া। কোন কর্মই শর্ত পূরণ ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা ছাড়া ছহীহ গণ্য হয় না।<sup>২১</sup>

১৯. সাবাব বা কারণ, শর্ত, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতিও প্রতীকী বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

২০. যখন কোন ব্যক্তির পালিত ফরজ ইবাদত ছহীহ হয়, তখন ঐ ব্যক্তি ফরজিয়াতের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় এবং তার উপর থেকে কর্মটি পালনের দাবী পূরণ হয়।

২১. الشرط এর আভিধানিক অর্থ: আলামত, প্রতীক প্রভৃতি।

পারিভাষিক অর্থ:

ইবাদতের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ হলো: ছালাতের সমস্ত ওয়াজিব, রুকন ও শর্ত পূরণ করে, যথা সময়ে তা আদায় করা।

লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে ছহীহ এর উদাহরণ হলো ক্রয়-বিক্রয়ের স্বীকৃত সমুদয় শর্ত পূরণ করে, প্রতিবন্ধকতা দূর করে ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা।

যদি কোন কর্মের মধ্যে কোন শর্ত না পাওয়া যায় অথবা কোন প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায়, তবে কর্মটি ছহীহ হিসাবে গণ্য হবে না। ইবাদতের ক্ষেত্রে শর্ত না পাওয়ার উদাহরণ হলো ওয়ু ছাড়াই ছালাত আদায় করা।<sup>২২</sup> লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে শর্ত না পাওয়ার উদাহরণ হলো এমন জিনিস বিক্রয় করা, যার সে মালিক নয়।<sup>২৩</sup>

ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার উদাহরণ হলো নিষিদ্ধ সময়ে সাধারণ নফল ছালাত আদায় করা। লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার উদাহরণ হলো জুম'আর দ্বিতীয় আজানের পর জুম'আ ফরয এমন ব্যক্তির অনুমোদিত পন্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা (এ সময় বৈধ নয়)।<sup>২৪</sup>

## ২. ফাসেদ -নষ্ট হওয়া:

الشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.

“অর্থাৎ শর্ত বলা হয়, যার অবিদ্যমানতা শর্তযুক্ত জিনিসের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে। তবে তার বিদ্যমানতা শর্তযুক্ত জিনিসের বিদ্যমানতাকে অবধারিত করে না।” যেমন; ছালাতের জন্য ওয়ু করা শর্ত। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ওয়ু ছাড়াই ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত ছহীহ হবে না। কিন্তু ওয়ু করলেই যে ছালাত পাওয়া যাবে, এমন নয়। কারণ অনেকেই ওয়ু করার পরও ছালাত আদায় নাও করতে পারেন।

السبب: কারণ বা উপকরণ। পারিভাষিক অর্থ:

السبب: ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود.

“অর্থাৎ যার বিদ্যমানতা উপকরণকৃত অর্থাৎ যার সে উপকরণ, সেটির বিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে এবং তার অবিদ্যমানতা উপকরণকৃত জিনিসটির অবিদ্যমানতাকে অবধারিত করে।”

المانع এর আভিধানিক অর্থ: বাধাদানকারী, প্রতিবন্ধক। পারিভাষিক অর্থ:

المانع: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود.

“অর্থাৎ যার বিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসের অবিদ্যমানতাকে আবশ্যক করে। তবে তার অবিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট জিনিসের বিদ্যমানতাকে অবধারিত করে না।” অর্থাৎ المانع ও الشرط সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

২২. যেহেতু ছালাত আদায় করার জন্য শর্ত হলো ওয়ু করা।

২৩. যেহেতু বিক্রয় ছহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিক্রয় যোগ্য পণ্যের মালিক হওয়া।

২৪. সূরা জুম'আ ৯ নং আয়াতে জুম'আর আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

ফাসেদ এর আভিধানিক অর্থ: ক্ষতিগ্রস্ত ও নষ্ট হয়ে যাওয়া। পারিভাষিক অর্থ:

ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقداً.

“যার কর্মের ফল তার উপর বর্তায় না, চাই সেটা ইবাদত হোক অথবা লেন-দেন হোক।”

সুতরাং ইবাদতের ক্ষেত্রে ফাসেদ হলো যে কর্ম দ্বারা দায়িত্ব মুক্ত হয় না এবং আদেশ বা নিষেধের দাবীও পূরণ হয় না। যেমন: সময়ের পূর্বেই ছালাত আদায় করা। লেন-দেনের ক্ষেত্রে ফাসেদ হলো যার কর্মের ফল তার উপর বর্তায় না। যেমন: অজ্ঞাত বস্তু বিক্রয় করা।<sup>২৫</sup> ইবাদত, লেন-দেন ও শর্তের ক্ষেত্রে প্রতিটি ফাসেদ জিনিসই হারাম। কেননা, এটি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘনের পর্যায়ভুক্ত এবং তার আয়াতকে উপহাসের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করার শামিল। উপরন্তু আল্লাহর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোকের কর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই।<sup>২৬</sup>

### ফাসেদ ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য:

দু’টি ক্ষেত্র ব্যতিত ফাসেদ ও বাতিল একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথম ক্ষেত্র: হাজীদের ইহরামের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে উসূলবিদগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, ফাসেদ হলো ঐ হজ্জ যাতে মুহরিম ব্যক্তি প্রথম হালাল (১০ ই যিলহজ্জ কুরবানী, মাথা মুন্ডন প্রভৃতি বিষয় পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া) এর পূর্বে স্ত্রী মিলন করে।<sup>২৭</sup> আর বাতিল বলা হয় যার কারণে ব্যক্তি দীন ইসলাম হতে বেরিয়ে (মুরতাদ) হয়ে যায়।<sup>২৮</sup>

২৫. যে কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো বিক্রয় যোগ্য পণ্য জ্ঞাত বিষয় হতে হবে। সুতরাং অজ্ঞাত বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করলে, উক্ত ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ গণ্য হবে।

২৬. ছহীহ বুখারী হা/ ২১৫৫, মুসলিম হা/ ১৫০৪।

২৭. মুহরিম ব্যক্তি প্রথম হালাল অর্থাৎ ১০ ই যিলহজ্জ কুরবানী, মাথা মুন্ডন প্রভৃতি সম্পন্ন করে হালাল হয়ে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রী মিলন করলে তার হজ্জ ফাসেদ গণ্য হবে। অতঃপর সে অন্যান্য হাজীদের মতই হজ্জের বাকী কাজ চালিয়ে যাবেন। তবে তাকে এ হজ্জের ক্বাযা আদায় করতে হবে।

২৮. মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় মুরতাদ হয়ে গেলে তার হজ্জ বাতিল গণ্য হবে। কাজেই সে ব্যক্তি পরক্ষণেই তাওবা করে মুসলিম হয়ে গেলে, তার জন্য জায়েয নেই হজ্জের বাকী কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া। বরং তার জন্য আবশ্যিক হলো পরবর্তীতে হজ্জ পুনরায় আদায় করা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র: বিবাহ। এক্ষেত্রে উসূলবিদগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন এভাবে যে, ঐ বিবাহকে ফাসেদ বলা হয়, যার ফাসেদ হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতানৈক্য করেছেন। যেমন: মেয়ের অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করা।<sup>২৯</sup>

পক্ষান্তরে ঐ বিবাহকে বাতিল বলা হয়, যার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণ সবাই একমত। যেমন: ইদ্দত পালনকারী মহিলার বিবাহ করা।<sup>৩০</sup>

---

২৯. কোন মেয়ে তার অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করলে অধিকাংশ ইমামদের মতে, উক্ত বিবাহ ফাসেদ বলে গণ্য হবে। তবে হানাফী মাযহাব মতে, মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক জ্ঞানবান হলে, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারবে।

৩০. ইদ্দত বা শোক পালনকারী মহিলার ইদ্দতের সময় সীমা পূর্ণ না করা পর্যন্ত বিবাহ করা সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। দ্র: সুরা বাক্বারা/২৩৫।

## ইলম-العلم

العلم - ইলম এর সংজ্ঞা:

العلم : إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.

“অর্থাৎ কোন জিনিসকে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে জানা।” যেমন: এটা জানা যে, ‘আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর পূর্ণ’ ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত প্রভৃতি।

আমাদের বক্তব্য: إدراك الشيء (কোন জিনিস সম্পর্কে জানা) এ শব্দ দ্বারা কোন জিনিস সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে না জানা ইলম বিলুপ্ত হয়েছে। এটাকে جهل بسيط বা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা বলা হয়। যেমন: কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বদর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? আর সে জবাবে বলে, আমি জানি না।

আমাদের বক্তব্য: على ما هو عليه (তার মূল স্বরূপের উপর জানা) এ অংশ দ্বারা ইলম থেকে বের হয়ে গেছে এমন জিনিস যা তার মূল স্বরূপ থেকে ভিন্ন ভাবে জানা যায়। এটাকে جهل مركب বা মিশ্র অজ্ঞতা বলা হয়। যেমন: কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, বদর যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? আর সে জবাবে বলে, হিজরী তৃতীয় সালে!<sup>৩১</sup>

আমাদের বক্তব্য: إدراكا جازما (দৃঢ়ভাবে জানা) এ কথা দ্বারা দৃঢ়ভাবে না জানা বিষয় বিলুপ্ত হয়েছে। এটা এভাবে যে, ব্যক্তি বিষয়টি যেভাবে জেনেছে তা দৃঢ় নয়। তাছাড়া অন্য দিকটিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সুতরাং এভাবে জানাকে ইলম হিসাবে অভিহিত করা হবে না।

অতঃপর সম্ভাব্য দু’টি জিনিসের মাঝে একটি যদি তার নিকট অগ্রগণ্য বলে প্রতিভাত হয়, তাকে ظن বা প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান বলে। আর যার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হলো তাকে وهم বা সংশয় বলে। পক্ষান্তরে যদি তার নিকটে উভয় জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাকে شك বা সন্দেহ বলে।

৩১. মিশ্র অজ্ঞতা হলো প্রথমত: সে জানে না কখন বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: সে যে বিষয়টি জানে না- এটাও সে বুঝতে পারে না!



উক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট হলো যে, কোন কিছু জানার সাথে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কযুক্ত:

১. العلم - এটি হলো কোন বিষয়কে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে জানা।<sup>৩২</sup>
২. جهل البسيط - বা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা হলো, কোন বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে না জানা।
৩. جهل مركب - মিশ্র অজ্ঞতা, এটা হলো কোন জিনিসকে তার মূল স্বরূপ থেকে ভিন্ন ভাবে জানা।
৪. ظن-প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান হলো কোন বিষয়কে জানা, সাথে তার বিপরীত অগ্রগণ্য বিষয়টিও সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।
৫. وهم-সংশয় হলো কোন বিষয়কে জানা, সাথে তার বিপরীত অগ্রগণ্য জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।
৬. شك বা সন্দেহ হলো, কোন জিনিসকে জানা, সাথে তার বিপরীত সমপর্যায়ের জিনিসটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা।

### ইলম এর প্রকারভেদ: العلم

ইলম দু'প্রকার। যথা:

১. العلم الضروري - বাধ্যগত ইলম
২. العلم النظري - চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম

১. العلم الضروري-বাধ্যগত ইলম: যেখানে জ্ঞাত বিষয়ের 'জানা' বাধ্যগত হয়।<sup>৩৩</sup> এটি এমন ভাবে হয় যে, দলীল, চিন্তা-গবেষণা ছাড়াই যা মানুষ জানতে বাধ্য হয়।

৩২. অর্থাৎ কোন জিনিসকে দৃঢ়তার সাথে সঠিক ভাবে জানা।

৩৩. অর্থাৎ যা মানুষ বাধ্যগতভাবে জানে।

যেমন: কোন কিছুর পূর্ণতা আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর, আগুন গরম, মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল প্রভৃতি জানা।<sup>৩৪</sup>

২. العلم النظري - চিন্তা-গবেষণা নির্ভর ইলম: যে ইলম অর্জনে দলীল-প্রমাণ ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন হয়, তাকে العلم النظري বা চিন্তা-গবেষণা মূলক ইলম বলে।  
যেমন: এটা জানা যে, ছালাতের ক্ষেত্রে নিয়ত ফরজ।

---

৩৪. এ ধরনের ইলম জ্ঞানী, সাধারণ মানুষ সবাই জানতে পারে। এ ধরনের ইলম কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যেমন: আল্লাহর একত্ববাদ, ছালাতের ফরজিয়াত, সুদ, মদ, যেনা প্রভৃতি হারাম হওয়া ইত্যাদি।

## কলাম-বাক্য

আভিধানিক ভাবে কলাম এর অর্থ হলো: অর্থবোধক উচ্চারিত শব্দ।<sup>৩৫</sup>

পারিভাষিক অর্থ: কলাম এর অর্থ হলো:

اللفظ المفيد

“অর্থাৎ উপকারী বাক্যকে কলাম বা বাক্য বলা হয়।”<sup>৩৬</sup> যেমন: আল্লাহ আমাদের রব বা প্রতিপালক, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নবী।

নূন্যতম যার দ্বারা বাক্য গঠিত হয় তা হলো, দু’টি ইসম বা বিশেষ্য দ্বারা অথবা একটি ইসম ও একটি ফে’ল দ্বারা। প্রথমটির উদাহরণ হলো رسول الله صلى الله عليه وسلم (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল)। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো استقام محمد (মুহাম্মদ সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

কলাম এর একবচন হলো كلمة। পরিভাষায় كلمة বলা হয়-

اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف.

“অর্থাৎ একক অর্থের জন্য গঠিত শব্দকেই كلمة বলা হয়।” এটি ইসম, ফেল বা হরফ হতে পারে। সুতরাং كلمة বা শব্দ তিন প্রকার। যথা: ক. ইসম বা বিশেষ্য খ. হরফ বা ক্রিয়া গ. حرف বা অব্যয়।

৩৫. আরবি ভাষায় বলা হয়- ما يلفظ به الإنسان অর্থাৎ মানুষ যা উচ্চারণ করে। সুতরাং লফয এর মধ্যে পাঁচটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত। তা হলো ১. ইসম বা বিশেষ্য ২. ফে’ল বা ক্রিয়া ৩. হরফ বা অব্যয় ৪. মুরাক্বাবে গাইরে মুফীদ বা অপরিপূর্ণ যৌগিক শব্দ ৫. মুরাক্বাবে মুফীদ বা বাক্য।

৩৬. اللفظ المفيد দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুরাক্বাবে মুফীদ বা বাক্য। সুতরাং বোবা লোকের ইশারা, লেখা প্রভৃতি দ্বারা ভাব বোঝা গেলেও, তা কলাম বা বাক্য নয়। যেহেতু এগুলি উচ্চারিত হয় না। অনুরূপ ভাবে যায়েদ, খালেদ প্রভৃতিও কলাম নয়, যেহেতু এগুলি দ্বারা পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না।

## ক. اسم বা বিশেষ্য:

‘যে শব্দ কোন সময় উল্লেখ না করেই নিজেই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে, তাকে ইসম বলে।’ اسم তিন প্রকার:

প্রথম প্রকার: যা عموم বা ব্যাপকতার উপকারীতা দেয়।<sup>৩৭</sup> যেমন: الموصولة الأسماء

দ্বিতীয় প্রকার: যা اطلاق বা শর্তহীনতার উপকারীতা দেয়। যেমন: হ্যাঁ বাচকের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট ইসমের ব্যবহার।<sup>৩৮</sup>

তৃতীয় প্রকার: যা خصوص বা নির্দিষ্টতার ফায়দা দেয়। যেমন: নির্দিষ্ট নাম সমূহ।<sup>৩৯</sup>

## খ. فعل বা ক্রিয়া

‘যে শব্দ নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করে এবং তার শব্দরূপের মাধ্যমে তিন কালের কোন এক কালকে নির্দেশ করে, তাকে ফে’ল বা ক্রিয়া বলে।’<sup>৪০</sup> এটি হয়তো বা ماضي বা অতীত কালের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: فهم - সে বুঝেছে, অথবা مضارع বা বর্তমান/ভবিষ্যত কালের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: يفهم সে বুঝতেছে বা বুঝবে, অথবা أمر বা নির্দেশের অর্থ প্রদান করবে। যেমন: افهم - তুমি অনুধাবন

৩৭. আম অর্থ ব্যাপক। এটি شئول عمومي বা ব্যাপক ভাবে তার সকল একককে বুঝায়। যেমন:

الإنسان দ্বারা ব্যাপক ভাবে সব মানুষকে বুঝায়। যে কোন একজনকে বুঝায় না।

৩৮. মুতলাক বা শর্তহীন। এটি কোন রূপ শর্ত ছাড়াই অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন একজনকে নির্দেশ করে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে না। যেমন: যদি বলা হয়: في الدار رجل (যে একজন লোক রয়েছে।) এর দ্বারা অনির্দিষ্ট ভাবে যে কোন একজন উদ্দেশ্য।

৩৯. আম, খাস, মুতলাক, মুকাইয়াদ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে অচিরেই আসছে ইনশাআল্লাহ।

৪০. শব্দরূপ দ্বারা বিভিন্ন কাল প্রকাশ করে। যেমন: فهم - সে বুঝেছে, يفهم সে বুঝতেছে বা বুঝবে, افهم - তুমি বুঝো প্রভৃতি। তাই যে সব শব্দ রূপের পরিবর্তনের মাধ্যমে কাল না বুঝিয়ে মূল ধাতুর মাধ্যমে কাল নির্দেশ করে, সেগুলি ফে’ল হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন: غار - দিন, ليلة - রাত প্রভৃতি।

করো। সকল প্রকার ফে'ল মুতলাক বা শর্তহীনতার ফায়দা দেয়। সুতরাং এতে عموم বা ব্যাপকতা নেই।<sup>৪১</sup>

## গ. حرف বা অব্যয়

যা অন্য পদের সাথে মিলিত হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করে, তাকে হরফ বা অব্যয় বলে। হরফ বা অব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত পদ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. عاطفة এটি (সংযোজক অব্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি হুকুমের মধ্যে معطوف ও معطوف عليه কে শরীক হওয়ার ফায়দা দেয়। এটি দলীল ছাড়া তারতীব দ্বারা ধারাবাহিকতার দাবী করে না আবার তা নাকচও করে না।<sup>৪২</sup>
২. -পদটি عاطفة (সংযোজক অব্যয়) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এবং হুকুমের মধ্যে معطوف ও معطوف عليه কে পর্যায়ক্রমে শরীক হওয়ার ফায়দা দেয়।<sup>৪৩</sup> এটি سببية (কারণ বর্ণনা করা) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪১. যেমন: যদি বলা হয় -صام يوم الإثنين- তিনি রবিবারে ছিয়াম রেখেছেন। এর দ্বারা যে কোন এক সোমবারে ছিয়াম রাখা বুঝায় সব সোমবারে ছিয়াম রাখা বুঝায় না। তবে ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ যদি ফে'লের সাথে যুক্ত হয়, তখন ফে'ল ব্যাপকতার উপকারীতা দিবে। যেমন: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الإثنين. অর্থ: রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবারে ছিয়াম রাখতেন। এখানে ব্যাপকভাবে সব সোমবার উদ্দেশ্য। যে কোন এক সোমবার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, كان শব্দটি অধিকাংশ সময় চলমান এর ফায়দা দেয়।

৪২. ভিন্ন দলীল থাকলেও পদটি তারতীবের ফায়দা দেয়। এর দলীল হলো আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله. -নিশ্চয় ছাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনের অন্যতম (সূরা বাক্বারা ২:১৫৭)। অত্র আয়াতটি ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে তারতীব বা ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে সাঈদ করাকে আবশ্যক করে না। কিন্তু হাদীছে আছে- إِبْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ -অর্থাৎ আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, তোমরাও তা দিয়ে শুরু করো। সুতরাং অত্র হাদীছের ভিত্তিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক।

৪৩. পদটি ধারাবাহিকতা ও পর্যায়ক্রমের ফায়দা দেয়। যেমন: আল্লাহর বাণী:

“তুমি কি লক্ষ্য করনি, নিশ্চয় আল্লাহ - ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة . তাআ'লা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। ফলে জমিন সবুজ হয়ে যায় (সূরা হাজ্জ ২২:৬৩)।”

৩. اللام الحارة-যের প্রদানকারী লাম। এর বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো কারণ বর্ণনা করা, মালিকানা বুঝানো, বৈধতা বুঝানো প্রভৃতি।
৪. على الحارة-যের প্রদানকারী على পদটির বেশ কিছু অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো এ অব্যয় পদটি ওয়াজিব হওয়ার ফায়দা দেয়।

### أقسام الكلام - বাক্যের প্রকারভেদ:

সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে বাক্য দু'প্রকার। যথা:

(১) خبر - বর্ণনামূলক বাক্য।

(২) إنشاء - অনুজ্ঞামূলক বাক্য।

(১) خبر - বর্ণনামূলক বাক্য।

ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته.

অর্থ: যে বাক্যকে সত্ত্বাগত ভাবে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা যায়, তাকে خبر (বর্ণনামূলক বাক্য) বলা হয়।

আমাদের বক্তব্য: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب (যাকে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা যায়) এ অংশ দ্বারা إنشاء (অনুজ্ঞামূলক বাক্য) বের হয়ে গেছে। কারণ এটাকে সত্য বা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। কেননা, এর মর্মার্থ তার সম্পর্কে কোন সংবাদ নয় যে, যেখানে বলা যেতে পারে, 'সে সত্য বলেছে' অথবা 'সে মিথ্যা বলেছে'।

আমাদের বক্তব্য: لذاته (সত্ত্বাগত ভাবে) এ শব্দ এর দ্বারা বের হয়ে গেছে এমন বর্ণনামূলক বাক্য, যাকে সংবাদ দাতার বিবেচনায় সত্য বা মিথ্যার সম্ভাবনা রাখে না। সুতরাং সংবাদ দাতার বিবেচনায় خبر (বর্ণনামূলক বাক্য) তিন প্রকার: যথা:

প্রথম: যাকে মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। যেমন: আল্লাহর বর্ণনা ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রমাণিত হাদীছ।

দ্বিতীয়: যাকে সত্য দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। যেমন: শারঈ বা জ্ঞানগত ভাবে অসম্ভব জিনিস সম্পর্কে খবর দেয়া। প্রথমটির (শারঈভাবে অসম্ভব) উদাহরণ হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরে নবুওয়াত দাবি করার সংবাদ দেয়া।<sup>৪৪</sup>

দ্বিতীয়টির (জ্ঞানগত ভাবে অসম্ভব) উদাহরণ হলো পারস্পরিক বিপরীতধর্মী দু'টি জিনিস একীভূত হওয়ার খবর দেয়া। যেমন: একই সময়ে একই চোখ স্থির ও নড়া-চড়া করার খবর দেয়া।<sup>৪৫</sup>

তৃতীয়ত: যাকে সত্য এবং মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়। হয়তো সমতার ভিত্তিতে অথবা একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। যেমন: কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে কোন ব্যক্তির খবর দেয়া প্রভৃতি।<sup>৪৬</sup>

## (২) إنشاء-অনুজ্ঞামূলক বাক্য

ما لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب.

‘যাকে সত্য অথবা মিথ্যার দ্বারা গুণান্বিত করা সম্ভব নয়, তাকে إنشاء বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য বলে।’ إنشاء বা অনুজ্ঞামূলক বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হলো أمر (নির্দেশ), نهي (নির্দেশ) প্রভৃতি। যেমন: আল্লাহর বাণী:

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না (সূরা আন-নিসা ৪:৩৬)।’<sup>৪৭</sup>

৪৪. যেহেতু কুরআনে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ নাবী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেখুন, সূরা আহযাব/৪০।

৪৫. অর্থাৎ কোন বস্তু একই সময়ে নড়া চড়া করা আবার স্থির থাকা মানবীয় জ্ঞান বিচারে অযৌক্তিক বিষয়।

৪৬. যেমন: সত্যতার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির সংবাদকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সত্য বলে জানবো আবার মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিচিত ব্যক্তির সংবাদকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মিথ্যা বলে জানবো। আর সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে কিছুই জানা যায় না, তার সংবাদ সত্য ও মিথ্যার ক্ষেত্রে সমসম্ভাবনা থাকবে।

একই বাক্য দু'দিক বিবেচনা করে একই সাথে বর্ণনামূলক ও অনুজ্ঞামূলক হতে পারে। যেমন: লেন-দেন বা চুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চারণযোগ্য হীগাহ বা শব্দরূপ। যেমন: بع - আমি বিক্রয় করলাম, قبلت - আমি গ্রহণ করলাম। উপরোক্ত বাক্য গুলি চুক্তিকারীর মনে যা রয়েছে- তার উপর প্রমাণ করার দিক দিয়ে خبر বা বর্ণনামূলক আবার এ বাক্য গুলির উপর ভিত্তি করে চুক্তি ধার্য হওয়ার দিক দিয়ে এটি إنشاء বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য।<sup>৪৮</sup>

কোন কোন সময় বাক্য خبر এর আকৃতিতে আসে কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয় إنشاء আবার এর বিপরীতও হয়। অর্থাৎ বাক্য ব্যবহৃত হয় إنشاء এর আকৃতিতে কিন্তু উদ্দেশ্য নেয়া হয় خبر বা বিধেয় হিসাবে।

প্রথমটির (খবর দ্বারা ইনশা উদ্দেশ্য) এর উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.

“ তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন পবিত্রতার সময়কাল অপেক্ষা করবে (সূরা আল-বাক্বারা ২:২২৮)। ”<sup>৪৯</sup>

আয়াতে يتربصن (তারা অপেক্ষা করবে) এ শব্দটি خبر হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أمر (আদেশ)।

এর ফায়দা হলো আদিষ্ট কাজটি সম্পন্ন করার ব্যাপারে এমন ভাবে গুরুত্বারোপ করা যেন কাজটি আদিষ্ট ব্যক্তির বিশেষণের ন্যায় এটি তার সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে।<sup>৫০</sup>

বিপরীতটির (অনুজ্ঞা মূলক বাক্য দ্বারা বর্ণনা মূলক বাক্য উদ্দেশ্য) উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী:

৪৮. যেহেতু বাক্যগুলি বক্তার মনে যা আছে তার খবর দিচ্ছে, সে হিসাবে এটি বর্ণনামূলক। আবার এটি অনুজ্ঞামূলকও বটে, যেহেতু এর বক্তাকে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিহিত করা সম্ভব নয়।

৪৯. আয়াতটির অর্থ হয়, তালাকপ্রাপ্তা নারীরা যেন তিন পবিত্রতার সময়কাল অপেক্ষা করে।

৫০. خبر মূলতঃ ছিফাত বা বিশেষণ। যেমন: زيد قائم - যায়েদ দণ্ডায়মান। এখানে দণ্ডায়মান হলো যায়েদ সম্পর্কে খবর যা তার একটি বিশেষণ বুঝাচ্ছে। সুতরাং তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ব্যাপারে যখন ইন্দত পালন করার খবর দেয়া হয়, সেটি যেন তাদেরই একটি ছিফাত বা বৈশিষ্ট্য যা পালনের দাবীকে গুরুত্বারোপ করে।



وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطيكم.

“যারা কুফরী করেছে, তারা ঈমানদার লোকদের বলে, ‘তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো, (এতে পাপ হলে) আমরা তোমাদের পাপের ভার বহন করবো’ (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:১২)।”

আয়াতে لنحمل শব্দটি أمر এর আকৃতিতে আসলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো خير অর্থাৎ আমরা বহন করবো।<sup>৫১</sup> এর ফায়দা হলো যার সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়, সেটিকে আবশ্যিক-অবধারিত জিনিসের স্থলে নিয়ে আসা।

ব্যবহারিক দিক থেকে ১৫ বা বাক্য দু’প্রকার।

(১) الحقيقة বা প্রকৃত অর্থবোধক।

(২) المجاز বা রূপক অর্থবোধক।<sup>৫২</sup>

৫১. অথচ আমার হিসেবে অর্থ হওয়ার কথা ছিল এরকম: ‘আমরা যেন বহন করি।’

৫২. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহি. বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ তিনি যুগ অর্থাৎ অর্থাৎ ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ যুগে কালামের এ বিভাজন প্রচলিত ছিল না। অথচ আরবী ভাষা সম্পর্কে পরবর্তীদের চেয়ে তারাই বেশি অবগত ছিলেন। ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, আবু হানীফা, আওযাঈ, দাউদ রহিমাহুল্লাহ প্রমুখ বিদ্বান ও তাদের শিষ্যদের লেখনীতে এর প্রমাণ মিলে। যারা মনে করে যে, প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ আলিম এবং অন্যান্য সালাফ ইমামগণ এ বিভাজন করেছেন, তাদের এ ধারণা সালাফ ইমামগণের বক্তব্যের ব্যাপারে অজ্ঞতা হিসাবে বিবেচিত হবে। যা মূলত মু’তাজিলা ও তাদের অনুসারীদের বক্তব্যে থেকে জানা যায়। আর তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ, অভিধান এবং নাহ্ কোন বিষয়েই তাদের ভূমিকা বা অবদান নেই। আর ভাষা ও নাহ্ শাস্ত্রবিদ খলীল, সিবওয়াইহ, কাসাস্, ফার্সা এবং তাদের মতো ভাষা ও ব্যাকরণবিদগণের মধ্যে অন্যরাও এ বিভাজনের সাথে পরিচিত ছিলেন না। দ্র: মাজমু’আ আল-ফাতওয়া ২০/৪০০-৪০৫ পৃ। আল্লামা ইবনুল কাইয়ুম রহি. এ বিভাজন বাতিল হওয়ার ৫০ টি দিক উল্লেখ করেছেন। দেখুন, مختصر

الصواعق المرسلة ২৭১ পৃ:। এ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার শাইখ হালিহ আল-উছাইমিন রহি. বলেন,

على كل حال نحن وضعنا في هذا الكتاب الحقيقة والمجاز وهو ففي تأليفنا لكن إنما وضعناه قبل أن يتبين لنا الصحة أو يتبين لنا بياناً واضحاً أنه لا مجاز.

এ কিতাবে আমরা হাক্কীকত ও মাজায সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যা আমাদের রচনার অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ সঠিক বিষয়টি আমাদের নিকট স্পষ্ট হওয়া অথবা মাজায বলতে কিছুই নেই এটার সুস্পষ্ট বর্ণনার আগেই আমরা তা লিপিবদ্ধ করেছি।

(১) الحقيقة প্রকৃত অর্থবোধক শব্দের পরিচয়:

فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له.

অর্থাৎ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থে তা ব্যবহৃত হওয়াকে হাক্কীকত বলে।

আমাদের কথা: ‘المستعمل (ব্যবহৃত অর্থবোধক শব্দ)’ কথাটির দ্বারা مهمل তথা অর্থহীন শব্দ বাদ হয়েছে। তাই এ ধরনের শব্দকে হাক্কীকত বা মাজায় কোনটিই গণ্য করা হবে না। فيما وضع له (যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে) এ অংশ দ্বারা মাজায় বা রূপক অর্থবোধক শব্দ বাদ পড়েছে।

হাক্কীকত তিন প্রকার। যথা:-

১. اللغوي বা আভিধানিক হাক্কীকত (আভিধানিক প্রকৃত অর্থ)।

২. الشرعي শারঈ হাক্কীকত (শরী‘আতগত প্রকৃত অর্থ)।

৩. العرفية বা পারিভাষিক হাক্কীকত (পরিভাষাগত প্রকৃত অর্থ)।

اللغوي বা আভিধানিক হাক্কীকত এর পরিচয়

هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.

অর্থাৎ অভিধানে শব্দ যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হওয়াকে اللغوي বা আভিধানিক হাক্কীকত বলে।

আমাদের কথা: ‘في اللغة (অভিধানে)’ সংজ্ঞার এ অংশের দ্বারা শারঈ ও পারিভাষিক হাক্কীকত বিলুপ্ত হয়েছে। الصلاة শব্দটি আভিধানিক হাক্কীকতের উদাহরণ। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে দু‘আ করা। অভিধানবিদদের বক্তব্য অনুযায়ী শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

## الشَّرْعِي هাক্কীকত

هي اللفظ المستعمل ففيمما وضع له في الشرع.

শারঈ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থে তা ব্যবহৃত হওয়াকে শারঈ হাক্কীকত বলে। উক্ত সংজ্ঞায় ‘ في الشرع ’ অংশ দ্বারা আভিধানিক ও পারিভাষিক হাক্কীকত বিলুপ্ত হয়েছে। الصلاة শব্দের শারঈ প্রকৃত অর্থ হচ্ছে,

هي الأقوال والأفعال المعلومة المفتحة بالتكبير المختمة بالتسليم.

অর্থাৎ ছালাত হচ্ছে নির্দিষ্ট কথা ও কর্ম যা আরম্ভ করা হয় তাকবির তথা আল্লাহ আকবার পাঠের মাধ্যমে আর শেষ হয় সালাম ফিরিয়ে। সুতরাং শরী‘আত প্রণেতার উদ্দেশ্যে অনুযায়ী শব্দটিকে উক্ত অর্থেই ব্যবহার করতে হবে।<sup>৫০</sup>

## العرفية বা পারিভাষিক হাক্কীকত

هي اللفظ المستعمل ففيمما وضع له في العرف.

অর্থাৎ পরিভাষায় শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থে শব্দ ব্যবহৃত হওয়াকে পারিভাষিক হাক্কীকত বলে।

সংজ্ঞায় ‘ في العرف ’ (পরিভাষায়) এ অংশ দ্বারা শারঈ ও আভিধানিক হাক্কীকত বিলুপ্ত হয়েছে। পারিভাষিক হাক্কীকতের উদাহরণ হচ্ছে الدابة বা চতুষ্পদ প্রাণী। পরিভাষায় এ শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো চার পা বিশিষ্ট প্রাণী। সুতরাং পরিভাষাবিদদের উদ্দেশ্যে অনুযায়ী শব্দটি উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

হাক্কীকতের এ তিন প্রকার জেনে রাখার উপকারীতা হচ্ছে, ব্যবহৃত হওয়ার স্থান ভেদে হাক্কীকি অর্থের উপর শব্দ প্রয়োগ করা। তাই অভিধানবিদদের উদ্দেশ্যে অনুযায়ী হাক্কীকতে লুগাবি বা আভিধানিক প্রকৃত অর্থে এবং শরী‘আতগত

৫০. অর্থাৎ কুরআন ও হাদীছে যখন ছালাত শব্দ আসবে, তখন এর দ্বারা শারঈ ছালাতই উদ্দেশ্য নেয়া হবে। যদি এ অর্থ উদ্দেশ্য নিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। যেমন: জানাযার ছালাত, ইসতিক্কার ছালাত প্রভৃতি।

ব্যবহারের ক্ষেত্রে হাক্কীকতে শারঈ তথা শরী‘আতগত প্রকৃত অর্থের উপরই শব্দ প্রয়োগ হবে।

## (২) المجاز মাজায বা রূপক অর্থ:

المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.

অর্থাৎ শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে মাজায বলা হয়। যেমন: বীরপুরুষ বুঝাতে أسد (সিংহ) শব্দের ব্যবহার। এখানে ‘المستعمل (ব্যবহারিক অর্থবোধক)’ এ অংশ দ্বারা مهمل তথা অর্থহীন শব্দ বাদ পড়েছে। তাই অর্থহীন শব্দকে হাক্কীকত বা মাজায কোন কিছুই বলা হবে না।

আমাদের কথা: (যে অর্থের জন্য শব্দ গঠন করা হয়েছে ঐ অর্থ ছাড়া) এ অংশ দ্বারা হাক্কীকত বিলুপ্ত হয়েছে। হাক্কীকি-প্রকৃত অর্থ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন সঠিক প্রমাণ ব্যতীরেকে মাজায বা রূপক অর্থে শব্দ প্রয়োগের বৈধতা নেই। এ দলীল-প্রমাণ ইলমুল বায়ান এর পরিভাষায় ‘القريبة বা ইঙ্গিত’ নামে পরিচিত।

মাজায-রূপক অর্থে শব্দ ব্যবহার যথার্থ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে প্রকৃত ও রূপক অর্থের মাঝে যোগসূত্র বা বন্ধন বিদ্যমান থাকা। যাতে প্রকৃত অর্থকে রূপক অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা যথাযথ হয়। এ বন্ধনকে ইলমুল বায়ান এর পরিভাষায় علاقة (সম্পর্ক) বলা হয়। এ সম্পর্ক হতে পারে مشابهة (পরস্পরিক সাদৃশ্য) বা অন্য কিছু। আর সম্পর্কে পারস্পারিক সাদৃশ্যতা বিদ্যমান থাকলে তাকে مجاز استعارة বলে। যেমন: রূপক অর্থে বীর পুরুষ বুঝাতে أسد (সিংহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর علاقة (সম্পর্ক) পারস্পারিক সাদৃশ্য ব্যতীত অন্য কিছু হলে তাকে مجاز مرسل বলে। আর কোন কিছুর দিকে মাজায-রূপক অর্থকে إسناد সম্বন্ধযুক্ত করা হলে তাকে مجاز عقلي বলা হয়। رعيانا المطر (আমরা ঘাস চড়িয়েছি) এর হাক্কীকি-

প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমরা বৃষ্টি চড়িয়েছি। এখানে المطر (বৃষ্টি) শব্দটি العشب (ঘাস) এর রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই শব্দটি মাজায় অর্থেই গণ্য।

عقلي এর উদাহরণ: أنبت المطر العشب (বৃষ্টি ঘাস উৎপন্ন করেছে)। এ বাক্যের প্রতিটি শব্দ হাক্কীকি-প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ঘাস উৎপন্ন হওয়ার সম্বন্ধ বৃষ্টির দিকে করা হয়েছে রূপক অর্থে। এখানে প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলাই ঘাস উৎপন্নকারী। তাই المطر শব্দটি সম্বন্ধের দিক থেকে মাজায়-রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। مجاز مرسل এর আরো অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো তা বৃদ্ধি পাওয়া ও বিলুপ্ত করণের মাধ্যমে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। উছুলবিদগণ নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করতঃ শব্দ বৃদ্ধির উদাহরণ দিয়েছেন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

কোন কিছুই তার অনুরূপ নয় (সূরা গুরা ৪২:১১)।

তারা বলেন, এখানে ٱ কাফ বর্ণটি অতিরিক্ত। যা আল্লাহর সাদৃশ্যতা নাকোচ করার বিষয়টি গুরুত্বারোপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

শব্দ বিলুপ্তির উদাহরণ: আল্লাহর বাণী: وسئل القرية অর্থ: জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদকে (সূরা ইউসূফ ১২:৮২)। বাক্যটি মূলে ছিল واسأل أهل القرية। অর্থাৎ জনপদের অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করুন।

উক্ত আয়াতাংশ হতে أهل (অধিবাসী) শব্দটিকে রূপকভাবে বিলুপ্ত করা হয়েছে। মাজায়ের আরো অনেক প্রকার রয়েছে যা ইলমুল বায়ানে আলোচনা করা হয়েছে। উছুলে ফিক্‌হের হাক্কীকত ও মাজায় সম্পর্কে মাত্র একটি দিক আলোচনা করা হলো। কেননা, শব্দের প্রকৃত অথবা রূপক উভয় অর্থ ও হুকুম সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। আল্লাহ তা‘আলাই এসম্পর্কে অধিক অবগত।

## সতর্কীকরণ

কুরআন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কালাম বা বাক্যের হাক্কীকত-প্রকৃত ও মাজায়-রূপক অর্থের বিভাজন পরবর্তী অধিকাংশ আলিমের নিকট প্রসিদ্ধ বিষয়। তবে বিদ্বানদের কতিপয় বলেছেন, কুরআনে কোন মাজায়-রূপক অর্থ নেই। আরো কতিপয় বলেছেন, কুরআনসহ অন্য কোথাও মাজায়-রূপক অর্থ বলতে কিছুই নেই। আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনী, পরবর্তীদের মাঝে আল্লামা শাইখ মুহাম্মদ আল-আমীন শানক্বীতি এ মন্তব্য করেন। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তার ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়ুম বর্ণনা করেন যে, এ বিভাজন গুরুত্বপূর্ণ তিন যুগের পরে আবিষ্কৃত পরিভাষা। তিনি এ কথাটি শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সমর্থন করেছেন। কেউ তা অবগত হলে তার নিকট সুস্পষ্ট হবে যে, এটিই সঠিক মত।

## الأمر আমর বা নির্দেশ

الأمر আমর এর সংজ্ঞা:

الأمر قول يتضمن طلب الفعل على سبيل الاستعلاء

নির্দেশ দাতা নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করে এমন বক্তব্যই হচ্ছে الأمر (নির্দেশ)।

সংজ্ঞা বিশ্লেষণ:

আমাদের ভাষ্য: قول (বক্তব্য) শব্দটির মাধ্যমে ইশারা-ইঙ্গিত সূচক শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে। তাই ইশারা দ্বারা কোন নির্দেশ করা হলেও তা أمر হিসাবে গণ্য হবে না। আর طلب الفعل (কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবী) এ অংশ দ্বারা نهي নিষেধ সূচক শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, نهي নিষেধ সূচক শব্দের মাধ্যমে কাজ না করা দাবী পেশ করা হয়। আর الفعل (কোন কাজ সম্পন্ন করা) এ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো কাজটির অস্তিত্ব প্রদান করা। তাই ‘আদিষ্ট কথা’ এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সংজ্ঞায় على سبيل الاستعلاء (নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে) এ অংশটুকুর মাধ্যমে التماس (সহপাঠী ও সমবয়সীদের পারস্পারিক চাওয়া), দু‘আ প্রভৃতি অর্থ যা أمر (নির্দেশ সূচক) শব্দে ‘ইঙ্গিত সূচক’ শব্দের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা أمر হতে বিলুপ্ত হয়েছে।<sup>৫৪</sup>

صیغ الامر আমরের ছীগাহ বা শব্দরূপ।

আমরের শব্দরূপ চারটি। যেমন:

১. فعل الأمر বা নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া। যেমন: আল্লাহর বাণী:

৫৪. বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীদের কাছে কোন জিনিস চাওয়া। যেমন: আমাকে একটি কলম দাও। দু‘আর সময় চাওয়া। যেমন: হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো। যেহেতু এসব শব্দ ব্যবহার করতঃ বক্তা নিজেকে উর্দ্ধতন মনে করে না। তাই এসব আমরের ছীগায় চাওয়া অর্থ থাকলেও তা আমর হিসাবে গণ্য হবে না।

## اِنَّ مَا اَوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

অর্থাৎ তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব হতে যা তোমার প্রতি প্রত্যাশ করা হয়েছে (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৪৫)।

(ক্রিয়ার অর্থ জ্ঞাপক ইসম বা বিশেষ্য)।

২. اسم فعل الأمر: حي على الصلاة (ছালাতের জন্য আসো।)

৩. المصدر النائب عن فعل الأمر: (নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া পদের স্থলাভিষিক্ত মাছদার বা ক্রিয়ামূল)। যেমন:

## فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ

যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা করো তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত করো (সূরা মুহাম্মাদ:৪৭:৪)।

৪. المضارع المقرون بلام الأمر: (নির্দেশ জ্ঞাপক লাম যুক্ত ফেলে মুদ্বারে-ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া)। যেমন: لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

যেন তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনো (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৪)।

কোন কোন সময় আমরের ছীগাহ ছাড়াও طلب الفعل বা ক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি পাওয়া যায়। যেমন: কোন কাজকে এরূপ বিশেষিত করা যে, এটা ফরয অথবা ওয়াজীব অথবা মানদূব অথবা তা আনুগত্য মূলক কাজ অথবা কোন কাজের কর্তাকে প্রশংসা করা অথবা কাজ বর্জনকারীকে নিন্দা করা অথবা কোন কাজের ছাওয়াব ধার্য হওয়া অথবা কোন কাজ পরিত্যাগকরীর শাস্তি ধার্য হওয়া।<sup>৫৫</sup>

৫৫. কোন বিষয়কে ফরয হিসাবে বিশেষিত করার উদাহরণ হলো: রসূল ছা. এর বাণী:

فَاعْلَمُوهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

তুমি তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন।

ছহীহ বুখারী হা/১৩৩২, ছহীহ মুসলিম হা/১৯। ওয়াজীব এর উদাহরণ:

غسل الجمعة واجب على كل محتلم



ما تقتضيه صيغة الأمر নির্দেশ জ্ঞাপক ছীগাহ-শব্দের চাহিদা: সাধারণত নির্দেশ জ্ঞাপক ছীগাহ আদিষ্ট বিষয় ওয়াজিব হওয়া এবং তা তৎক্ষণাৎ পালিত হওয়ার চাহিদা প্রকাশ করে। আমার এর ছীগাহ ওয়াজিব হওয়ার দলীল: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

জুম'আর দিন গোসল করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর ওয়াজীব। ছহীহ বুখারী হা/৮২০, ছহীহ মুসলিম হা/৮৪৬।

কোন কর্ম আনুগত্য হিসাবে বিশেষিত করার উদাহরণ: রসূল ছা. এর বাণী:

من أطاع أميري فقد أطاعني

যে কেউ আমার আমীরের আনুগত্য করলো, সে যেন আমারই আনুগত্য করলো। আবু দাউদ হা/২৫৫৪।

কোন কর্মের কর্তাকে প্রশংসা করার উদাহরণ: রসূল ছা. এর বাণী:

نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কতই না উত্তম লোক! যদি সে রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতো। বায়হাকী হা/১১২।

কোন কাজ বর্জন করার কারণে নিন্দা করার উদাহরণ হলো:

من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة كفرها

তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করার পর যে অজ্ঞতা বশতঃ তা ছেড়ে দিলো, সে মূলত একটি নি'আমতের সাথে কুফরী করলো। জামে ছহীহ লি-সুনান হা/৬১৪২।

কোন কর্মের উপর ছাওয়াব ধার্য হওয়ার উদাহরণ হলো:

من صلى على صلاة صلى الله عليه بت عشرًا

যে আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার দয়া করেন।

ছহীহ মুসলিম হা/৩৮৪, আবু দাউদ ৫২৩।

কোন কাজ বর্জন করার কারণে শাস্তি ধার্য হওয়ার উদাহরণ: রসূল ছা. বলেন,

من ترك ثلاث جمع تمأونا طبع الله على قلبه

যে কেউ অবহেলা করে পরপর তিন জুমু'আ ছেড়ে দিবে আল্লাহ তার অন্তরে মহর মেরে দিবেন।

আবু দাউদ হা/১০৫২, নাসাঈ হা/১৩৫৯।

সুতরাং দেখা যায়, আমরের চার ছীগাহ ও আনুষঙ্গিকসহ মোট ১২ ভাবে আমর হতে পারে।

যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে (সূরা আন-নূর ২৪:৬৩)।

অত্র আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণের কারণ হলো, রসূল ছা. এর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সতর্ক করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা ফিতনায় নিপতিত হবে। আর ফিতনা হলো সত্যপথ হতে বিচ্যুত হওয়া। অথবা তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে। কেবল ওয়াজিব বর্জনের কারণে এরূপ হুশিয়ারী দেয়া হয়। তাই প্রমাণিত হয় যে, রসূল ছা. এর নির্দেশ পালন ওয়াজিবের চাহিদা প্রকাশ করে।

أمر নির্দেশ জ্ঞাপক ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ পালনের চাহিদা প্রকাশ করে এ প্রসঙ্গে দলীল হলো, আল্লাহর বাণী:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

তোমরা সংকাজে প্রতিযোগিতা মূলক এগিয়ে যাও (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৪৮)।

শারঈ নির্দেশিত সকল বিষয় কল্যাণকর। তাই কল্যাণের কাজে প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ তাৎক্ষণিকভাবে পালন করা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে আরো দলীল হলো, রসূল ছা. হুদায়বিয়ার দিন কুরবানীর পশু যবেহ করা ও মাথা মুন্ডন করার জন্য ছাহাবীদেরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তা পালনে ছাহাবীদের বিলম্ব করাকে তিনি অহুন্দ করেন। এ কারণে যে কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন তা উম্মে সালামার নিকট ব্যক্ত করেন। তাই বুঝা যায়, তাৎক্ষণিক আদেশ পালন অধিক সতর্কতা ও দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য অধিকতর সহায়ক। তা ছাড়া বিলম্বে নির্দেশ পালনে অনেক সমস্যা রয়েছে। (উদাহরণ স্বরূপ তাৎক্ষণিক নির্দেশ পালন না করায়) অনেক ওয়াজিব বিষয় একত্রিত হয়, ফলে একপর্যায়ে তা পালনে ব্যক্তি অক্ষমতা প্রকাশ করে। আমার কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন দলীলের দাবির প্রেক্ষিতে ওয়াজিব ও তৎক্ষণাৎ পালনের চাহিদা থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

১. أمر الندب (পালন করা বাঞ্ছনীয়) এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী:

وَأَشْهَدُوا إِذَا بَيَّعْتُمْ

তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখো (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৮২)।

পাস্পারিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখার নির্দেশটি মানদূবের জন্য প্রযোজ্য। (ওয়াজিবের জন্য নয়)। দলীল হলো:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يَشْهَدْ

রসূল ছা. এক বেদুইন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। কিন্তু কোন সাক্ষী রাখেননি।<sup>৫৬</sup>

২. الإطاحة বৈধতা অর্থে ব্যবহৃত হওয়া। কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়ার পর أمر ব্যবহৃত হলে অধিকাংশ সময় তা পালন করা বৈধ অথবা কোন বিষয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হলে أمر এ অর্থে ওয়াজিব হয়। নিষেধাজ্ঞার পর أمر ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

যখন তোমরা ইহরাম থেকে হালাল হবে তখন শিকার করো (সূরা আল-মায়িদা ৫:২)।

এখানে প্রাণী শিকার করার নির্দেশটি বৈধতা ঘোষণা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এ নির্দেশ আল্লাহর বাণীতে প্রাপ্ত নিষেধাজ্ঞার পর এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ

ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হালাল মনে করো না (সূরা আল-মায়িদা ৫:১)।

নিষিদ্ধ হওয়ার সংশয়ের পর أمر ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ হলো, বিদায় হজের সময় ইদের দিন পালনীয় কিছু কর্ম আগে-পরে পালন করা সম্পর্কে যারা রসূল ছা. কে প্রশ্ন করেছিল তাদের জবাবে রসূল ছা. বলেন,

افعل ولا حرج

পালন করো কোন সমস্যা নেই।<sup>৫৭</sup>

৩. التهديد ধমক অর্থে। যেমন আল্লাহর বাণীঃ

৫৬. আবু দাউদ হা/৩৬০৭, নাসাঈ হা/৬২৪৩।

৫৭. বুখারী হা/৮৩, মুসলিম হা/১৩০৬।

{اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [فصلت: من الآية 40],

তোমরা যা ইচ্ছা করো, নিশ্চয় তিনি দেখেন তোমরা যা করো (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪১:৪০)।

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا} [الكهف: من الآية 29]

আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি (সূরা আল-কাহাফ ১৮:২৯)।

উক্ত নির্দেশের পর শাস্তি প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নির্দেশটি ধর্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তৎক্ষণাৎ পালন করা অর্থ ব্যতীরেকে বিলম্বে পালন করা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ: রমাদ্বানের ক্বাযা ছিয়াম পালন করা আদিষ্ট বিষয়। কিন্তু দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বুঝা যায়, তা তৎক্ষণিক পালন করা আবশ্যিক নয় বরং বিলম্বে পালনীয়। যেমন: আয়িশা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

আমার রমাদ্বান মাসের ছিয়াম অবশিষ্ট থেকে যেতো। রসূল ছা. এর খিদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে শা'বান মাস ছাড়া অন্য সময়ে আমি তা আদায় করার সুযোগ পেতাম না।<sup>৫৮</sup>

যদি নির্দেশটি বিলম্বে পালন করা হারাম হতো, তাহলে আয়িশা রা. কে তা পালন করার উপর বহাল থাকতে দেয়া হতো না।

ما لا يتم المأمور إلا به

যা ছাড়া নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন হয় না।

নির্দেশিত কাজ সম্পন্ন করার বিষয়টি কোন জিনিসের উপর নির্ভর করলে তখন ঐ জিনিসটিও নির্দেশিত হিসাবে গণ্য হয়। তাই নির্দেশিত বিষয়টি ওয়াজীব হলে ঐ জিনিসটিও ওয়াজীব হয়ে যায়, কাজটি মানদূব (বাঞ্ছনীয়) হলে ঐ জিনিসও মানদূব (বাঞ্ছনীয়) হয়ে যায়।

ওয়াজীবের উদাহরণ: গোস্তাঙ্গ ঢেকে রাখা ওয়াজীব। যেহেতু গোস্তাঙ্গ ঢেকে রাখা কাপড় ক্রয় করার উপর নির্ভর করে তাই কাপড় ক্রয় করা ওয়াজীব হয়ে যায়।

মানদূবের উদাহরণ: জু‘আর দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা মানদূব (বাহ্জুনীয়)। যেহেতু সুগন্ধি দেয়া তা ক্রয় করার উপর নির্ভর করে তাই সুগন্ধি-প্রসাধনি ক্রয় করা মানদূব (বাহ্জুনীয়) হিসাবে গণ্য। এ নিয়মটি একটি ব্যাপক মূলনীতির অন্তর্গত। আর তা হলো,

الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.

কোন বিষয়ে উদ্দেশ্যে এর হুকুম ‘উপকরণের’ হুকুম হিসাবে গণ্য হবে। তাই আদিষ্ট বিষয়ের উপকরণ আদিষ্ট বলেই গণ্য এবং নিষিদ্ধ বিষয়ের উপকরণ নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হবে।

## النَّهْي-নিষেধ

## النَّهْي-নিষেধ এর পরিচিতি:

قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية

অর্থাৎ النَّهْي (নিষেধ) হলো এমন বক্তব্য যা لا অব্যয়যুক্ত المضارع এর নির্দিষ্ট ছীগাহ-শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে উদ্ধৃতন মনে করে কোন কাজ সম্পন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখা।

## النَّهْي এর উদাহরণ:

আল্লাহর বাণী:

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ {الأنعام: من الآية 150}

তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশনাবলীকে মিথ্যা মনে করে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না (সূরা আল-আন'আম ৬:১৫০)।

আমাদের ভাষ্য: قول (বক্তব্য) দ্বারা ইঙ্গিত সূচক শব্দ বিলুপ্ত হয়েছে। তাই ইঙ্গিত সূচক শব্দ 'নিষেধ' এর অর্থ প্রদান করলেও তা النَّهْي হিসাবে গণ্য হবে না। طلب (বিরত থাকার দাবি) এ অংশ দ্বারা أمر বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ আমার কোন কাজ সম্পন্ন করার দাবি নির্দেশ করে। على وجه الاستعلاء (নিজেকে উদ্ধৃতন মনে করা) এ অংশ দ্বারা পারস্পারিক চাওয়া, দু'আ করা যা ইঙ্গিতের মাধ্যমে النَّهْي থেকে পাওয়া যায় তা النَّهْي এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বাদ পড়েছে।

المضارع এর নির্দিষ্ট ছীগাহ-শব্দের মাধ্যমে) এ অংশ দ্বারা এই সব বিষয় বিলুপ্ত হয়েছে যা আমরের ছীগাহ মাধ্যমে কোন কাজ থেকে বিরত থাকার দাবি পেশ করা হয়। যেমন: دع-তুমি ছেড়ে দাও। ترك-তুমি বর্জন করো। كف-তুমি বিরত থাকো ইত্যাদি। এসব শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ থেকে বিরত থাকার দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাই এ শব্দসমূহ نهي নয় বরং তা أمر হিসাবে গণ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে نهي এর ছীগাহ

ছাড়াও অন্যান্য শব্দের মধ্যে طلب الكف (বিরত থাকার দাবি) নিহিত আছে। যেমন: কোন কাজ হারাম-নিষিদ্ধ, মন্দ প্রভৃতি গুণে বিশেষিত করা অথবা কোন কাজের কর্তাকে নিন্দা করা অথবা কোন মন্দ কাজ করলে শাস্তি আরোপ করা ইত্যাদি।<sup>৫৯</sup>

ما تقتضيه صيغة النهي

النهي এর ছীগার মাধ্যমে যে দাবি পেশ করা হয়।

النهي এর ছীগার মাধ্যমে নিষিদ্ধ বিষয় হারাম এবং কোন কিছু অন্যায় হিসাবে গণ্য হওয়ার দাবি পেশ করা হয়। এ ছীগা ব্যবহৃত হওয়ার মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত করণের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا { [الحشر: من الآية 7]

রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো (সূরা আল-হাশর ৫৯:৭)।

বুঝা যায়, তিনি যা কিছু নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজীব সাব্যস্ত হয়। সর্বপরি নিষিদ্ধ কর্মটি হারাম হওয়াই উদ্দেশ্যে। নিষিদ্ধ কর্ম অন্যায় গণ্য হওয়ার উদাহরণ: নাবী ছা. এর বাণী:

৫৯. কোন কাজ হারাম হিসাবে আখ্যায়িত করার উদাহরণ: আল্লাহর বাণী:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম (সূরা আল-বাক্বারা ২:২৭৫)।

কোন কর্মকে মন্দ হিসেবে আখ্যায়িত করার উদাহরণ হলো: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

“كُفِّرَ بِكُفْرَتِ الْكَلْبِ خَبِيثٍ”

কোন কর্মের কারণে শাস্তি বর্ণিত হওয়ার উদাহরণ হলো: আল্লাহর বাণী:

(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)

‘যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সজ্জরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।’-সূরা আন নিসা ১০।

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

কেউ এমন কোন কাজ করলো যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।<sup>৬০</sup>

‘নিষিদ্ধ বিষয়’ কি বাতিল হবে নাকি হারাম হওয়া সত্ত্বেও ছহীহ হয়ে যাবে? এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের মূলনীতি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

- (১) নিষেধাজ্ঞা আরোপিত নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বে বা শর্তের দিকে ফিরে যাবে। এমতাবস্থায় কর্মটি বাতিল গণ্য হবে।
- (২) নিষেধাজ্ঞা বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যাবে, যা নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বে বা শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় কর্মটি বাতিল গণ্য হবে না।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বে দিকে ফিরে যায়, এর দৃষ্টান্ত হলো: দু’ঈদের দিন সিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা।

পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ নিষিদ্ধ বিষয়ের সত্ত্বে দিকে ফিরে যায়, এর দৃষ্টান্ত হলো: যার উপর জুম’আর ছালাত ফরজ এমন ব্যক্তিকে জুম’আর দিন দ্বিতীয় আজানের পর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করা।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ নিষিদ্ধ বিষয়ের শর্তের দিকে ফিরে যায় এর দৃষ্টান্ত হলো: পুরুষকে রেশমের কাপড় পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা। ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। সুতরাং কেউ যখন নিষিদ্ধ কাপড় পরিধান করে লজ্জাস্থান ঢাকবে, নিষেধাজ্ঞা ছালাতের শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার কারণে, ছালাত শুদ্ধ হবে না।<sup>৬১</sup>

পারস্পরিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ নিষিদ্ধ বিষয়ের শর্তের দিকে ফিরে যায়- এর দৃষ্টান্ত হলো: গর্ভস্থিত প্রাণী ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা। যেহেতু বিক্রয় শুদ্ধ

৬০. ছহীহ মুসলিম ১৭১৮।

৬১. কিছু বিদ্বান বলেছেন, হারাম পোষাক পরিধান করে ছালাত আদায় করলে, তার ছালাত হয়ে যাবে। তবে হারাম পোষাক পরিধান করার কারণে সে গোনাহগার হবে। তারা আরো বলেছেন, এতে মূলত নিষেধাজ্ঞাটি শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ শর্ত হলো, লজ্জাস্থান ঢাকা। যেহেতু ছালাত আদায়কারী লজ্জাস্থান ঢেকেছে, কাজেই তার ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি সরাসরি রেশমের কাপড় পরে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হতো, তবে নিষেধাজ্ঞাটি শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট হতো। দেখুন: শরহুল মমতি’ ২/১৫১, আল ইখতিয়ারাত /৪১।



হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিক্রয়যোগ্য পণ্য সম্পর্কে জানা। কাজেই কেউ যখন গর্ভস্থিত প্রাণী বিক্রয় করবে, নিষেধাজ্ঞা শর্তের দিকে ফিরে যাওয়ার কারণে বিক্রয়টি শুদ্ধ হবে না।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যায়- এর দৃষ্টান্ত হলো: পুরুষকে রেশমের পাগড়ী পরিধান করার নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং কেউ যদি রেশমের কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করে, তাহলে তার ছালাত বাতিল হবে না। কেননা, এখানে নিষেধাজ্ঞা ছালাতের সত্ত্বা বা শর্তের দিকে ফিরে যায় নি।

পারস্পারিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ‘নিষেধাজ্ঞা’ বহিরাগত কোন বিষয়ের দিকে ফিরে যায়- এর দৃষ্টান্ত হলো: ধোঁকা দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ধোঁকা দিয়ে কোন কিছু বিক্রয় করে, তাহলে তার বিক্রয়টি বাতিল হবে না। কারণ নিষেধাজ্ঞাটি ক্রয়-বিক্রয়ের সত্ত্বা বা শর্তের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়নি।

ভিন্ন দলীলের দাবির কারণে ‘হারাম সাব্যস্ত’ করার অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

- (১) মাকরুহ: উসূলবিদগণ এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে। তিনি বলেছেন

لَا يَمْسُنْ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ

‘তোমাদের কেউ যেন পেশাব করা অবস্থায় তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে।’<sup>৬২</sup>

অধিকাংশ বিদ্বান বলেছেন, এখানে নিষেধাজ্ঞা হলো মাকরুহ এর জন্য প্রযোজ্য। কেননা, লজ্জাস্থান মানুষেরই একটি অঙ্গ বিশেষ। এখানে নিষেধ করার তাৎপর্য হলো, ডান হাতকে তা হতে বিরত রাখা।

- (২) الإرشاد: নির্দেশনা দেওয়ার জন্য: যেমন: মুআ‘য রাযিয়াল্লাহু আনহুর উদ্দেশ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

لَا تَدْعُنَ أَنْ تَقُولَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعْتِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحَسَنَ عِبَادَتِكَ»

প্রত্যেক ছালাতের পর এ দু'আ বলা অবশ্যই ছেড়ে দিবে না। দু'আটি হলো: - اللهم  
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك হে আল্লাহ, আমাকে তোমার যিকর, তোমার  
শুকরিয়া ও ভালো ইবাদত করতে সহযোগিতা করো।<sup>৬৩</sup>

### يدخل في الخطاب بالأمر والنهي

أمر و نهي দ্বারা সম্বোধনে কারা অন্তর্ভুক্ত হবে?

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي «هو» المكلف، وهو البالغ العاقل.

أمر দ্বারা সম্বোধনের মধ্যে মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের দায়িত্ব বর্তায় এমন ব্যক্তি  
অন্তর্ভুক্ত হবে। আর মুকাল্লাফ বলতে প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানবান ব্যক্তি।

আমাদের ভাষ্য: البالغ (প্রাপ্ত বয়স্ক) শব্দটি দ্বারা শিশু বিলুপ্ত হয়েছে। তাই শিশু  
আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দায়িত্বপ্রাপ্তির সমান  
হবে না। তবে ভালো মন্দ পার্থক্য করার বয়সে উপনীত হওয়ার পর আনুগত্যমূলক  
কাজের প্রশিক্ষণ হিসেবে তাকে ইবাদত পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে এবং  
সীমালঙ্ঘন মূলক কাজে তাকে বাধা দেওয়া হবে যাতে অন্যায় থেকে বিরত থাকার  
অভ্যাস গড়ে ওঠে।

আমাদের বক্তব্য: العاقل (জ্ঞানবান) দ্বারা মস্তিস্ক বিকৃত হয়েছে এমন ব্যক্তি বিলুপ্ত  
হয়েছে। সুতরাং পাগল আদেশ নিষেধের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে না। তবে অন্যের উপর  
সীমালঙ্ঘন করা থেকে এবং ধ্বংসাত্মক কাজ হতে তাকে বাধা দেওয়া হবে। যদি সে  
কোন আদিষ্ট বিষয় পালন করে, তবে তাতে আনুগত্যের উদ্দেশ্য না থাকার কারণে  
শুদ্ধ হবে না।

তবে শিশু ও পাগলের সম্পদে যাকাত ফরয হওয়া ও ‘অর্থনৈতিক অধিকার’ উক্ত  
বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ এগুলির আবশ্যিকতাসুনির্দিষ্ট কিছু কারণের সাথে  
যুক্ত। যখনই সেই কারণ গুলি পাওয়া যাবে, তখনই হুকুম সাব্যস্ত হবে। এতএব  
এগুলিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ‘কারণ’; ‘ব্যক্তি’ নয়।

আদেশ নিষেধের দায়িত্ব মুসলিম, কাফির সবার উপর বর্তায়। কিন্তু কাফের ব্যক্তির জন্য কুফরী অবস্থায় আদিষ্ট বিষয় পালন করা শুদ্ধ নয়। আল্লাহর বাণী:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ { [التوبة: من الآية 54].

তাদের অর্থ সাহায্যে নিষেধ করা হয়েছে এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তার রসূলকে অস্বীকার করে (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫৩)।

তবে কাফের অবস্থায় ছুটে যাওয়া আমল মুসলিম হওয়ার পর কায্য করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে পূর্বে যা কিছু ঘটে গেছে তা ক্ষমা করা হবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৩৮)।

রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله»

হে আমার, তুমি কি জানো না, নিশ্চয় ইসলাম পূর্বের সমস্ত গোনাহকে মিটিয়ে দেয়।<sup>৬৪</sup> আর কুফরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে শরীয়ত নির্দেশিত বিষয় পালন করা ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে তাদের জবাব সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

{مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ} [المذثر: 42] {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} [المذثر: 43] {وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ} [المذثر: 44] {وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المذثر: 45] {وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ} [المذثر: 46] {حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ} [المذثر: 47]

জান্নাতীরা বলবে, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা ছালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, অভাব গ্রন্থকে খাদ্য দিতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম। আমাদের নিকট মৃত্যু আসা পর্যন্ত (সূরা আল-মুদ্দাছিহর ৭৪: ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭)।

موانع التكليف - শরীয়তের দায়িত্ব আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সমূহ:

কারো উপর শরীয়তের দায়িত্ব আরোপিত হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো: অজ্ঞতা, ভুলে যাওয়া, বাধ্য করা প্রভৃতি। রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘য়ালা আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেওয়া হয়, তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।<sup>৬৫</sup> হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ ও বায়হাকী। হাদীছটির বিশুদ্ধতা প্রমাণে কুরআন ও হাদীছে আরো অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

جهل - অজ্ঞতা: جهل হলো না জানা। সুতরাং মুকান্নাফ ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের হারাম হওয়া সম্পর্কে না জেনে হারাম কাজটি করে ফেলে, তাহলে তার উপর কোন শাস্তি ধার্য হবে না। যেমন: কোন ব্যক্তি ছালাতে কথা বলা হারাম হওয়ার ব্যাপারটি না জেনে কথা বললো। অনুরূপ ভাবে যদি কোন ব্যক্তি ওয়াজিব কর্ম ছেড়ে দেয়, তার ওয়াজিব সম্পর্কে না জানার কারণে, তবে উক্ত ওয়াজিব কর্ম পালন করার নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়ে থাকলে, ঐ ব্যক্তিকে তা ক্বাযা আদায় করতে হবে না। দলীল: রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে অতীতের ছালাত ক্বাযা করার নির্দেশ দেননি। বরং তাকে শুধু বর্তমান ছালাত শারঈ পছায় সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

النسيان - ভুলে যাওয়া: النسيان হলো কোন জ্ঞাত বিষয় অন্তরে স্বরণ করতে না পারা।<sup>৬৬</sup> এতএব কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ কোন কাজ করলে, তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে

৬৫. ইবনু মাজাহ /২০৪৩, বাইহাকী ৬/৮৪, আজালুনী তার ‘কাশফুল খাফা’ (১/৫২৩/১৩৯৩) নামক গ্রন্থে বলেছেন, ‘ইমাম নভবী র: তাঁর গ্রন্থ ‘আর রওয়া’ ও ‘আল-আরবাব্বিন’ নামক গ্রন্থে হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।’

হাফেয ইবনু কাছীর র: তার ‘তুহফাতুত তুলিব’ (১/২৭১/১৫৮) নামক গ্রন্থে হাদীছটির সনদ উত্তম বলেছেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী র: হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন। দেখুন: সহীহুল জামে’ / ১৭৩১।

৬৬. অন্তরের বেখেয়াল হয়ে যাওয়া- এভাবে বললে তার অর্থ দাঁড়ায় মানুষের স্মৃতি বা মেমোরী অন্তরে থাকে। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে এটা প্রমাণিত যে, মানুষের মেমোরী থাকে মস্তিষ্কে। অন্তরের কাজ হলো বুঝা, উপলব্ধি করা, ভালো মন্দ নিরূপণ করা প্রভৃতি। আর মস্তিষ্কের কাজ হলো তা সংরক্ষণ করা। কাজেই نسيان এর সংজ্ঞা এভাবে দিলে আর কোন আপত্তি থাকে না।

না। যেমন: কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ ছিয়াম অবস্থায় কিছু খেয়ে নিলো। অনুরূপ ভাবে কোন ব্যক্তি কোন ওয়াজিব কাজ ভুলবশতঃ ছেড়ে দিলো, তাহলে ভুল অবস্থায় তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। তবে তা স্মরণ হওয়া মাত্র তাকে তা আদায় করতে হবে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها»

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি কোন ছালাত আদায় করতে ভুলে যায়, সে যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ে নেয়।’<sup>৬৭</sup>

الإمراه হলো কোন ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে বাধ্য করা, যা সে আদৌ করতে চায় না। এতএব কোন ব্যক্তিকে কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করা হলে, তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। যেমন: কোন ব্যক্তিকে যদি কুফরী করতে বাধ্য করা হয়, অথচ তার অন্তর ঈমানের সাথেই প্রশান্ত আছে। অনুরূপ ভাবে কোন ব্যক্তিকে যদি ওয়াজিব কাজ পালন না করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে বাধ্যগত অবস্থায় তার উপর কোন কিছুই বর্তাবে না। তবে বাধ্যগত অবস্থা দূর হয়ে গেলে, তাকে তা ক্বাযা করতে হবে। যেমন: কোন ব্যক্তিকে ছালাত আদায় না করতে বাধ্য করা হলো, এমনকি তা আদায়ের সময় চলে গেলো, তাহলে তার এই বাধ্যগত অবস্থা দূর হয়ে গেলে, তাকে উক্ত ছালাত ক্বাযা করতে হবে।

উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ কেবল আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, এসব কারণ ক্ষমা ও দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। এতএব সৃষ্টি জীবের হকের ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব আদায় করা আবশ্যিক, সেক্ষেত্রে হকদার ব্যক্তি তার দাবি ছেড়ে দিতে সম্মত না হলে, উক্ত বিষয়সমূহ প্রতিবন্ধক হিসাবে গণ্য হবে না।<sup>৬৮</sup>

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

النسيان هو الذهول عن شيء معلوم.

অর্থাৎ নসিয়ান হলো কোন জ্ঞাত বা জানা জিনিস ভুলে যাওয়া।

৬৭. ছহীহ বুখারী /৫৯৭, ছহীহ মুসলিম /৬৮৪।

৬৮. যেমন: কোন ব্যক্তি অন্যের কাপড় নিজের মনে করে পরিধান করলো। অতঃপর দেখলো যে, কাপড়টি পুরাতন হয়ে গেছে, ফলে কাপড়টি ছিঁড়ে ফেললো। সুতরাং অন্যের কাপড় জানার পর কাপড় ওয়ালা দাবি না ছাড়লে, তাকে উক্ত কাপড়ের জরিমানা দিতে হবে।

عام ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ।

عام এর সংজ্ঞা: العام এর আভিধানিক অর্থ অন্তর্ভুক্তকারী।

عام এর পারিভাষিক অর্থ:

اللفظ المستغرق لجميع أفرادِه بلا حصر

عام হলো এমন শব্দ যা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

পূণ্যবান লোকেরা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে (সূরা আল-ইনফিতার ৮২:১৩)।

আমাদের ভাষ্য: العام (যা তার সমস্ত একককে शामिल করে)। এ অংশ দ্বারা ঐ সকল জিনিস বিলুপ্ত হয়েছে যা কেবল একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: নির্দিষ্ট নাম। যা কেবল একটি একককে অন্তর্ভুক্ত করে। আর হ্যাঁ বাচক অর্থের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য প্রযোজ্য হয়। যেমন: আল্লাহর বাণী:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

একটি দাস মুক্ত করতে হবে (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)।

উক্ত আয়াতাত্মক ব্যাপকভাবে সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং অনির্দিষ্টভাবে যে কোন একজনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

عام (সীমাহীন) এ অংশ দ্বারা ঐ সব জিনিস বিলুপ্ত হয়েছে যা সীমাবদ্ধতার সাথে তার সমস্ত একককে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন: সংখ্যাবাচক বিশেষ্য একশ, এক হাজার ইত্যাদি।

عام ব্যাপক অর্থবোধক শব্দাবলী:

عام এর শব্দরূপ ৭ টি। যথা:

(১) মৌলিকগত ভাবে শব্দ ব্যাপক অর্থের উপর প্রমাণ করে। যেমন:

كل وجميع، وكافة، وقاطبة، وعمامة؛

كل-সব, সবাই, جميع-সবাই, كافة-সকল, قاطبة-সমস্ত, عامة-ব্যাপক।

আল্লাহর বাণী:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

আমি সব কিছু পরিমিত করে সৃষ্টি করেছি (সূরা আল-ক্বামার ৫৪:৪৯)।

(২) أسماء শর্তের অর্থ জ্ঞাপক বিশেষ্য। যেমন: আল্লাহর বাণী:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

যে কেউ ভালো কাজ করে, সে তার নিজের জন্যই করে (সূরা আল-জাছিয়া ৪৫:১৫)।

فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ

তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে (সূরা আল-বাক্বারা ২:১১৫)।

(৩) أسماء প্রশ্নবোধক বিশেষ্য: আল্লাহর বাণী:

فَمَنْ يَأْتِيَكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ

কে তোমাদের নিকট পৌছে দিবে প্রবাহমান পানি? (সূরা আল-মূলক ৬৭:৩০)।

مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

তোমরা রসূলদের কি জবাব দিয়েছিলে? (সূরা আল-কাছাছ ২৮:৬৫)।

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

তোমরা যাচ্ছে কোথায়? (সূরা আত-তাক্বীর ২৯:২৬)।

(৪) (الأسماء الموصولة) সম্বন্ধ সূচক বিশেষ্য: আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ {الزمر: 33}.

যারা সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাইতো আল্লাহভীরু (সূরা আয-যুমার ৩৯:৩৩)।

তিনি আরো বলেন,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যারা আমার পথে সাধনায় আত্ম নিয়োগ করে অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৬৯)।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى

যারা ভয় করে, তাদের জন্য এতে উপদেশ রয়েছে (সূরা আন-নাযি'আত ৭৯:২৬)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

আসমান সমূহ ও জমিনের মাঝে যা কিছু রয়েছে সব কিছু আল্লাহর জন্যই (সূরা আলে ইমরান ৩:১২৯)।

(৫) النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري (না বোধক অথবা নিষেধ সূচক অথবা শর্ত কিংবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নবোধক শব্দের প্রেক্ষাপটে অনির্দিষ্ট বিশেষ্য ব্যবহৃত হওয়া। আল্লাহর বাণী:

وما من اله الا الله

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই (সূরা আলে-ইমরান ৩:৬২)। তিনি আরোও বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

আল্লাহর ইবাদত করো, তার সাথে কাউকে শরীক করো না (সূরা আন-নিসা ৪:৩৬)।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفَوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ করো অথবা গোপন করো আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৪)।

مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ



আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না? (সূরা ক্বাছাছ ২৮:৭১)।

(৬) المعرف بالإضافة- সম্বন্ধ সূচক পদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হওয়া হোক তা একবচন অথবা বহুবচন। যেমন: আল্লাহর বাণী:

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

তোমরা ঐ নি‘আমতের কথা স্মরণ করো যা আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন (সূরা আ‘রাফ ৭:৭৪)।

(৭) المعرفة بالاستغرافية- সমুদয় অর্থ জ্ঞাপক অল এর মাধ্যমে বিশেষ্যপদ নির্দিষ্ট হওয়া। হোক তা একবচন বা বহুবচন। যেমন: আল্লাহর বাণী:

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে (সূরা নিসা ৪:২৮)।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি প্রার্থনা করে (সূরা আন-নূর ২৪:৫৯)।

কোন বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার অবগত হওয়া অনুসারে العهدية অল দ্বারা মা‘রেফা বা নির্দিষ্ট হয়। যদি তাদের জ্ঞাত বিষয়টি عام হয় তাহলে এ অল দ্বারা মা‘রেফা বা নির্দিষ্ট শব্দটি عام হবে। আর শব্দের জ্ঞাত বিষয়টি خاص হলে অল দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য পদটিও خاص হবে।<sup>৬৯</sup>

৬৯. ال الاستغرافية - عام এর মধ্যে শুধুমাত্র العهدية - الجنسية - الاستغرافية অল তিন প্রকার। তিন প্রকার অল ফায়দা দেয়। এই অল চেনার উপায় হলো: ال এর স্থলে كل শব্দ ব্যবহৃত করা শুদ্ধ হবে। যেমন: আয়াতের الانسان শব্দটির ال হলো الاستغرافية। কাজেই উক্ত অল এর স্থলে كل শব্দ ব্যবহার করলেও অর্থের কোন পরিবর্তন হবে না। আবার অন্য ভাবেও এটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

## عام এর উদাহরণ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ {ص: 71}

স্বরণ করো, তোমার প্রতিপালক ফিরিস্তাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কাদা মাটি থেকে (সূরা ছ ৩৮:৭১)।

তিনি আরোও বলেন,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

যখন আমি তাকে সুসম করবো এবং তাতে আমার রুহ ফুঁকে দিবো, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদানাবত হও (সূরা ছ ৩৮:৭২)।

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

তখন ফিরিস্তারা সকলেই সিজাদানাবত হলো (সূরা ছ ৩৮:৭৩)।<sup>৭০</sup>

خاص এর উদাহরণ: আল্লাহর বাণী:

كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا

যেমন পাঠিয়েছিলাম ফিরআউনের নিকট (সূরা মুযাম্মিল ৭৩:১৫)।

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا

ফিরআউন সেই রসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম (সূরা মুযাম্মিল ৭৩:১৫)।

যেমন: ১. ذكرى - যেখানে উদ্দেশ্যপূর্ণ বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা থাকে। যেমন: فعصى فرعون الرسول - আয়াতে الرسول দ্বারা উদ্দেশ্য মুসা আ: যার উলে-খ পূর্বে করা হয়েছে।

২. أكرم الرجل - উদ্দেশ্যপূর্ণ বিষয়টি উপস্থিত থাকে। যেমন বলা: حضوري.

৩. قال الامام - উদ্দেশ্যপূর্ণ জিনিস বক্তা ও শ্রোতার মস্তিষ্কে থাকে। যেমন: তুমি বলবে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম আহমাদ।

৭০. আয়াতের দ্বিতীয় الْمَلَائِكَةُ এর হলো العهدية, এর দ্বারা الاستغراق বা عام এর অর্থ উদ্দেশ্য হবে। কেননা, প্রথম الْمَلَائِكَةُ এর হলো الاستغراقية

جنس বা জাতিবাচক ١١ দ্বারা বিশেষ্যপদ মা'রেফা বা নির্দিষ্ট হলে ঐ পদটি তার সকল একককে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতএব, যখন তুমি বলো, নারী অপেক্ষা পুরুষ উত্তম। এ কথার দ্বারা এটা উদ্দেশ্যে নয় যে, প্রত্যেক পুরুষলোক প্রত্যেক নারী থেকে উত্তম। বরং উদ্দেশ্যে হলো নারী জাতি থেকে পুরুষ জাতি উত্তম। যদিও কতিপয় নারী পুরুষ থেকে উত্তম।

### العمل بالعام

অর্থাৎ ব্যাপক অর্থবোধক শব্দানুসারে আমল করা।

عام শব্দের ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী আমল করা আবশ্যিক যতক্ষণ না তার নির্দিষ্টতা প্রমাণ হয়। আল-কুরআন ও হাদীছের নছ-মূল রচনার মর্মার্থের দাবী অনুসারে আমল করা ওয়াজীব। যতক্ষণ না তার বিপরীতে কোন দলীল পাওয়া যায়।

عام নির্দিষ্ট কারণের প্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হলে তার ব্যাপকতা অনুসারে আমল করা ওয়াজীব। কেননা, শব্দের ব্যাপকতাই ধর্তব্য, নির্দিষ্ট কারণ ধর্তব্য নয়। তবে কোন দলীলের মাধ্যমে যদি عام নির্দিষ্টতার অর্থ দেয়, যা ঐ কারণের অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যে কারণের প্রেক্ষিতে আম বর্ণিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে عام তার সাদৃশ্য পূর্ণ বিষয়ের সাথে খাছ-নির্দিষ্ট হবে।

عام কে খাছ-নির্দিষ্টকারী দলীল নেই এমন উদাহরণ হলো: যিহারের আয়াত সমূহ। কেননা, আউস বিন ছামিত রা. এর যিহার করার কারণে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। অতএব, যিহারের হুকুম আউস বিন ছামিতসহ সকলের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থ প্রযোজ্য হবে। عام কে খাছ-নির্দিষ্ট করার উদাহরণ: রসূল ছা. এর বাণী:

«ليس من البر الصيام في السفر»

সফরে ছিয়াম পালন করা পুণ্যের কাজ নয়।<sup>৭১</sup>

এ হাদীছটি বর্ণিত হওয়ার কারণ হলো, রসূল ছা. কোন এক সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি মানুষের সমাবেশ লক্ষ্য করলেন, সেখানে এক ব্যক্তিকে ছায়া দেয়া

হচ্ছিল, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কি হচ্ছে? ছাহাবীরা বললেন, তিনি ছিয়াম রেখেছেন। এমতবস্থায় তিনি বললেন, সফরে ছিয়াম পালন করা পূণ্যের কাজ নয়।

১৬ ঐ ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, যার অবস্থা এ ব্যক্তির অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তা হলো সফরে ছিয়াম পালন করা কষ্টকর। উক্ত ১৬ কে এভাবে খাছ করার দলীল হলো সফর কষ্টকর না হলে রসূল ছা. সফরে ছিয়াম রাখতেন। আর পূণ্যহীন কাজ তিনি কখনোই পালন করতেন না।

### خاص বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ।

خاص এর সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে عام শব্দটি عام এর বিপরীত।

পারিভাষিক অর্থ:

اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد

خاص এমন শব্দ যা কোন ব্যক্তি বা সংখ্যার দ্বারা সীমায়িত কোন কিছু বুঝায়।

যেমন: নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম, ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রভৃতি।

আমাদের ভাষ্য: محصور على অংশটুকুর মাধ্যমে عام বিলুপ্ত হয়েছে।

التخصيص (নির্দিষ্ট করা) এর সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ: এ শব্দটি التعميم বা ব্যাপক করণের বিপরীত।

পারিভাষিক অর্থ:

إخراج بعض أفراد العام.

অর্থাৎ التخصيص (নির্দিষ্ট করা) হলো العام এর কিছু একককে বিলুপ্ত করা।

خاص কারী। তিনি (ছোয়াদ বর্ণে যের দিয়ে) ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে কারী। তিনি হলেন শরীয়ত প্রণেতা। শব্দটি ঐ দলীলের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়, যার মাধ্যমে অর্জিত হয়। خاص করার দলীল দু'প্রকার। যেমন: ১. متصل (সংযুক্ত দলীল) ২. منفصل (অসংযুক্ত দলীল)।<sup>৭২</sup>

৭২. একটি শব্দের অর্থের আওতায় যতগুলি একক রয়েছে, যদি ঐ শব্দ দ্বারা সবগুলো একক বুঝায়, তাহলে ঐ শব্দকে عام বলে। অতঃপর কোন শব্দ যদি عام এর কিছু একককে হুকুমের সাথে নির্দিষ্ট করে অন্য কিছু একককে বের করে দেয়, তবে তাকে خاص বলে। যেমন: কুরআনে বলা আছে-

إن الإنسان لفي خسر - إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

এখানে প্রথম আয়াতের الإنسان দ্বারা উদ্দেশ্য সমস্ত মানুষ। কাজেই শব্দটি عام। কিন্তু পরের আয়াতগুলো প্রথম আয়াতের عام কে خاص করে দিয়েছে। কাজেই এখন ক্ষতিগ্রস্ত সব মানুষ নয়। বরং যারা ঈমান আনে না এবং সংকর্ম করে না, তারাই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত।

১. সংযুক্ত দলীল (متصل) : হলো যা স্বতন্ত্র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয় না।

২. منفصل (অসংযুক্ত দলীল): যা স্বতন্ত্র আলাদাভাবে ব্যবহৃত হয়।

خاص কারী সংযুক্ত দলীলের অন্যতম হলো:

প্রথমত استثناء: এটি আভিধানিকভাবে الثني থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো কোন জিনিসের কিছু অংশকে অন্য অংশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। যেমন: ثني الحبل-দড়ির একাংশকে অপর অংশের উপর রাখা।

পারিভাষিক অর্থ:

إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أحوالها

অর্থাৎ استثناء হলো إلا বা তার সমগোত্রীয় কোন অব্যয়ের মাধ্যমে عام এর কিছু একককে বের করে দেওয়া। যেমন: আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ {العصر: 2} {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 3]

নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের (সূরা আল-আহর ১০৩:২,৩)।”

আমাদের বক্তব্য: بإلا أو إحدى أحوالها তথা إلا বা তার সমগোত্রীয় কোন অব্যয়ের দ্বারা شرط ও অন্যান্য উপায়ে خاص করা বিলুপ্ত হয়েছে।<sup>৭৩</sup>

استثناء এর শর্ত : استثناء শুদ্ধ হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে।

তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

অতঃপর যে দলীল عام কে خاص করে দেয়, তা দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। যদি خاص কারী দলীল عام এর সাথে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে متصل বলে। পক্ষান্তরে خاص কারী দলীল যদি عام এর সাথে সংযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত না হয়ে আলাদা ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে منفصل বলে।

৭৩. عام কে বিভিন্ন উপায়ে خاص করা যায়। যেমন: শর্ত, গুণবাচক শব্দ الاستثناء ইত্যাদি।

(১) এটি مستثني منه এর সাথে প্রকৃত অথবা বিধানগত ভাবে সংযুক্ত থাকবে।

প্রকৃতভাবে متصل বা সংযুক্ত থাকা হলো: حرف الاستثناء টি مستثني منه এর সাথে এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা যে, উভয়ের মাঝে কোন فاصل বা বিভাজনকারী শব্দ থাকে না।

বিধানগতভাবে متصل বা সংযুক্ত থাকা হলো: উভয়ের মাঝে এমন فاصل থাকে, যা প্রতিরোধ করা যায় না। যেমন: হাঁচি, কাশি ইত্যাদি।

যদি উভয়ের মাঝে এমন فاصل আসে, যা প্রতিরোধ করা সম্ভব অথবা উভয়ের মাঝে নিরব থাকে, তাহলে استثناء শুদ্ধ হবে না। যেমন: এটা বলা যে, আমার দাসগুলো স্বাধীন। এটা বলার পর চুপ থাকে অথবা অন্য কোন কথা বার্তা বলে। অতঃপর বলে, তবে যাইদ ব্যতীত। তাহলে এভাবে বলাতে استثناء শুদ্ধ হবে না। বরং সবাইকে স্বাধীন করতে হবে।

এ ব্যাপারে এটাও বলা হয় যে: মাঝখানে চুপ থাকলে অথবা فاصل থাকলেও استثناء শুদ্ধ হবে, যদি (سكوت বা فاصل এর আগে ও পরের) কথা একই প্রসঙ্গে হয়। এ ব্যাপারে দলীল হলো,

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীস। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন: আল্লাহ তা'য়ালা যখন আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিনি এ শহরকে সম্মানিত করেছেন। সুতরাং এখানের কাঁটায়ুক্ত বৃক্ষ কেটে ফেলা যাবে না এবং এখানকার ঘাসও মুলোৎপাটন করা যাবে না। তখন আব্বাস (রা:) বললেন: হে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইযখির ঘাস ব্যতীত। কারণ এটি আমাদের কবর ও ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। অতঃপর তিনি বললেন: তবে ইযখির ঘাস ব্যতীত।

অত্র হাদীছটি এর উপর প্রমাণ বহন করার কারণে এ মতটি অধিকতর অগ্রগণ্য।

(২) مستثني منه টি مستثني এর অর্ধেকের বেশি হবে না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আমার উপর আবশ্যক হলো তাকে ছয় কম দশ দিরহাম প্রদান করা। এভাবে استثناء শুদ্ধ হবে না। সুতরাং তাকে দশ দিরহামই প্রদান করতে হবে।

এ ব্যাপারে এটাও বলা হয় যে, এটি শর্ত নয়। কাজেই استثناء শুদ্ধ হয়ে যাবে, যদিও مستثنى টি مستثنى منه এর অর্ধেকের বেশি হয়। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে তার জন্য চার দিরহাম প্রদান করাই আবশ্যিক হবে।<sup>৭৪</sup>

কিন্তু যদি সম্পূর্ণটাকেই استثناء করে, তাহলে উভয় মত অনুসারেই استثناء শুদ্ধ হবে না। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি তাকে দশ কম দশ দিরহাম টাকা প্রদান করবো, তাহলে তার জন্য সম্পূর্ণ দশ দিরহামই প্রদান করা আবশ্যিক হবে।

استثناء যখন সংখ্যা বাচক হবে তখনই এ শর্তটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু استثناء যদি গুণ বাচক হয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে, যদিও مستثنى থেকে مستثنى সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ বেরিয়ে যায়। যেমন: ইবলিসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

“যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে (সূরা হিজর ১৫:৪২)।”

এমনকি যদি বলি: أعط من في البيت إلا الأغنياء - বাড়ীতে যারা আছে তাদেরকে দান করো, তবে ধনীদের নয়। অতঃপর দেখা গেল যে, বাড়ীর সবাই ধনী।

তাহলেও استثناء শুদ্ধ হবে। এবং কাউকেই কিছু দেওয়া হবে না।

দ্বিতীয়ত: خاص কারী দলীল যা مستثنى منه এর সাথে সংযুক্ত থাকে, তার মধ্যে আরেকটি হলো الشرط (শর্ত)।

شرط এর আভিধানিক অর্থ হলো: আলামত বা নিদর্শন।

এর দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো:

تعليق شيء بشيء وجوداً أو عدماً بأن الشرطية أو إحدى أحوالها

৭৪. এ ব্যাপারে দ্বিতীয় মতটিই সহীহ। কাজেই مستثنى টি مستثنى منه এর অর্ধেকের বেশি হলেও استثناء শুদ্ধ হয়ে যাবে।



কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভ করা বা না করা ক্ষেত্রে শর্তবোধক **إِنْ** বা তার সমগোত্রীয় অব্যয়ের মাধ্যমে কোন বস্তুকে অপর কোন বস্তুর সাথে ঝুলিয়ে দেয়া।”

عام - شرط কে করে দেয়। চাই শর্তটি **مستثنى منه** এর আগে ব্যবহৃত হোক অথবা পরে ব্যবহৃত হোক। **شرط** আগে ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ হলো: মুশরিকদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

“কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।” (সূরা আত-তাওবাহ ৯:৫)।

شرط পরে আসার উদাহরণ হলো: আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ [النور: ৩৩] .

“তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে (সূরা আন-নূর ২৪:৩৩)।”

তৃতীয়ত: **صفة** বা গুণবাচক শব্দ। আর তা হচ্ছে,

ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال

**صفة** হলো যা গুণ, বদল, অবস্থার বিবরণ ইত্যাদির এমন অর্থ নির্দেশ করে যার সাথে **عام** এর কিছু **فرد** (একক) বিশেষিত থাকে। যেমন:

**نعت** (গুণ) এর উদাহরণ হলো: আল্লাহর বাণী:

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتْيَاكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ

“ সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। ” (সূরা আন-নিসা ৪:২৫)।<sup>৭৫</sup>

بدل এর উদাহরণ হলো: আল্লাহর বাণী:

وَلِّلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

“এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার।” (সূরা আলে-ইমরান ৩:৯৭)।<sup>৭৬</sup>

حال এর উদাহরণ হলো: আল্লাহর বাণী:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا.

“ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। ” (সূরা আন-নিসা ৪:৯৩)।<sup>৭৭</sup>

خاص কারী বিচ্ছিন্ন দলীল:

خاص কারী বিচ্ছিন্ন দলীল হলো: যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে আসে। এগুলি ৩টি। যথা: ১.

الحس (শরীয়ত) ৩. الشرع (বিবেক) ২. العقل (অনুভূতি) ১. الحس

الحس বা অনুভূতির মাধ্যমে الخاص করার দলীল হলো: আ‘দ জাতীর উপর প্রেরিত বায়ু সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

تَذَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

৭৫. অর্থাৎ প্রথমে فَتَيَّاكُم বলাতে সব দাসীকে বিবাহ করা বুঝাচ্ছিল। কিন্তু পরের الْمُؤْمِنَاتِ গুণবাচক শব্দ দ্বারা শুধু মাত্র মুমিন দাসী খাস হয়ে গেলো।

৭৬. আয়াতে النَّاسِ বলাতে সব মানুষের উপর হজ্জ ফরয বুঝা যাচ্ছিল। কিন্তু النَّاسِ থেকে بدل হওয়া مِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا বলাতে হজ্জের বিধানটি যাদের সামর্থ আছে, তাদের সাথে খাছ হয়ে গেলো।

৭৭. আয়াতে مُتَعَمِّدًا না বলা হলে অর্থ হতো কাউকে হত্যা করলেই তার পরিণাম জাহান্নাম হবে। কিন্তু শব্দ দ্বারা হুকুমটি খাছ হয়ে গেলো যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাদের সাথে।

“তার পালনকর্তার আদেশে সে সব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে (সূরা আল-আহকাফ ৪৬:২৫)।”

আমাদের অনুভূতি প্রমাণ করে যে, উক্ত বায়ু আসমান ও জমিনকে ধ্বংস করেনি। জ্ঞানের মাধ্যমে عام কে خاص করার দলীল: আল্লাহর বাণী:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ

“আল্লাহ সর্বকিছুর স্রষ্টা”

আমাদের জ্ঞান প্রমাণ করে যে, তার সত্তা সৃষ্টি নয়।

কিছু বিদ্বান মনে করেন, জ্ঞান ও অনুভূতির মাধ্যমে যে خاص হয়, এটি মূলত عام থেকে খাস হয়নি। বরং এটি এমন عام যার দ্বারা خاص উদ্দেশ্য। কারণ خاص কৃত বিষয়টি গুরু থেকেই বক্তা বা শ্রোতা কারোই উদ্দেশ্য ছিলো না। এটি হলো বাস্তবে ঐ عام, যা দ্বারা خاص উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত: শরীয়তের মাধ্যমে خاص করা। কেননা কুরআন ও হাদীছকে অনুরূপ জিনিস অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্রিয়াস দ্বারা خاص করা হয়।

কুরআনকে কুরআন দ্বারা خاص করার উদাহরণ: আল্লাহর বাণী:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ

“আর তালাক প্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত (সূরা আল-বাক্বারা ২:২২৮)।”

উক্ত আয়াতটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা خاص হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ

“মুমিনগণ! তোমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইদ্দত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৪৯)।”<sup>৭৮</sup>

কুরআনকে হাদীছ দ্বারা خاص করার দলীল হলো: মীরাছের আয়াত:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান (সূরা আন-নিসা ৪:১১)।”

এ আয়াত এবং এর মত অন্যান্য আয়াতসমূহ নিচের হাদীছ দ্বারা خاص হয়েছে।  
রসূল ছা. বলেছেন,

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“কোন মুসলিম কাফের ব্যক্তির উত্তরাধিকার হবে না এবং কোন কাফের মুসলিম ব্যক্তির উত্তরাধিকার হবে না।”<sup>৭৯</sup>

কুরআনকে ইজমা এর মাধ্যমে خاص করার দলীল হলো:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

“যারা সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে (সূরা আন-নূর ২৪:৬৪)।”

আয়াতটি নিম্নোক্ত ইজমার মাধ্যমে خاص হয়েছে। এখানে ইজমা হলো অপবাদ দানকারী দাসকে ৪০ টি বেত্রাঘাত করা হবে।

উক্ত উদাহরণটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ভেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আমি এর ত্রুটিমুক্ত কোন উদাহরণ খুঁজে পাইনি।<sup>৮০</sup>

৭৮. প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, কোন নারী তালাকপ্রাপ্তা হলেই তাকে তিন হায়েয পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। কিন্তু আয়াতের মাধ্যমে উক্ত হুকুম খাছ হয় যে, যদি বিবাহের পর মেলামেশা করার আগেই তালাক হয়, তাহলে কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না।

৭৯. ছহীহ বুখারী হা/৪২৮৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৬১৪।

কিয়াসের মাধ্যমে কুরআনকে خاص করার উদাহরণ: আল্লাহর বাণী:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ

“ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশ” করে বেত্রাঘাত কর (সূরা আন-নূর ২৪:২)।”

প্রসিদ্ধ মতানুসারে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর শাস্তির অর্ধেক করে পঞ্চাশ বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর ব্যভিচারী দাসকে কিয়াস করে অত্র আয়াতটি خاص করা হয়েছে।<sup>৮১</sup>

হাদীছকে কুরআন দ্বারা خاص করার উদাহরণ: রসূল ছা.বাণী:

“... أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله”

আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষদের সাথে যুদ্ধ করতে, যতক্ষণ না তারা এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ছা.আল্লাহর রসূল।”<sup>৮২</sup>

হাদীছটি নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা خاص হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম জানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে (সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৯)।”

হাদীছকে হাদীছের মাধ্যমে خاص করার উদাহরণ: রসূল ছা. এর বাণী:

৮০. অর্থাৎ দাস অপবাদ দিলে তাকে অর্ধেক শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সব বিদ্বান একমত নন। বরং কিছু বিদ্বান তাদেরকে স্বাধীন ব্যক্তির মতই ৮০ টি বেত্রাঘাত করার কথা বলেছেন। সূরা নূর ২/২।

৮১. অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যভিচার করবে, তাকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে। কিন্তু দাসী যেনা করলে, তাকে ৪০ বেত্রাঘাত করা হয়। দাসীর উপর দাসকে কিয়াস করে, দাসকেও ৪০ বেত্রাঘাত করার বিধানের মাধ্যমে আয়াতটি খাছ করা হয়।

৮২. ছহীহ বুখারী হা/১৩৯৯, ছহীহ মুসলিম হা/২০

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ.

“বৃষ্টির পানিতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ ওশর দিতে হবে।”<sup>৮৩</sup>

অত্র হাদীসটি নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা خاص করা হয়েছে।

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“পাঁচ ওয়াসাক এর কম ফসলে কোন যাকাত নেই।”<sup>৮৪</sup>

ইজমার মাধ্যমে হাদীছকে خاص করার কোন উদাহরণ আমি খুঁজে পাইনি। ক্বিয়াসের মাধ্যমে হাদীসকে خاص করার উদাহরণ: রসূল ছা. বলেন,

الْبَكْرُ بِالْبَكْرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ

“অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা করলে, একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে।”<sup>৮৫</sup>

প্রসিদ্ধ মতানুসারে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে দাসীর শাস্তি অর্ধেক করে পঞ্চাশ বেত্রাঘাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার উপর ব্যভিচারী দাসকে ক্বিয়াস করে হাদীছকে خاص করা হয়েছে।

৮৩. ছহীহ বুখারী হা/১৪৮৩

৮৪. ছহীহ বুখারী হা/১৪৮৪। অর্থাৎ প্রথম হাদীস দ্বারা বৃষ্টির পানিতে উৎপন্ন যে কোন পরিমাণ ফসলে যাকাত ফরয বুঝা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীসটি যাকাত খাছ করে দিচ্ছে ফসল নূন্যতম পাঁচ ওয়াসাক হওয়ার সাথে। উল্লেখ্য যে, এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা’; এক সা’ সমান ২ কেজী ৪০ গ্রাম ভাল গম। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক হলো: ৩০০ সা’ = ৬১২ কেজি বা ১৫.৩ মণ বা ১৫ মণ ১২ কেজি।

৮৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৬৯০

## الشَّرْطُ وَالْمَقِيدُ (শর্তহীন ও শর্তযুক্ত)

مطلق এর সংজ্ঞা: আভিধানিকভাবে مطلق শব্দটি مقيد এর বিপরীত।

مطلق এর পারিভাষিক অর্থ:

ما دل علي الحقيقة بلا قيد

“مطلق হলো যা কোনরূপ শর্ত ছাড়াই কোন حقيقة বা বাস্তবতার উপর প্রমাণ করে। যেমন আল্লাহর বাণী:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۖ

“তাদের কাফফারা এ একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)।”<sup>৮৬</sup>

সুতরাং আমাদের বক্তব্য: ما دل علي الحقيقة (যা কোন حقيقة বা বাস্তবতার উপর প্রমাণ করে) এ অংশ দ্বারা عام বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, এটি عموم এর উপর প্রমাণ করে, শুধুমাত্র শর্তহীন বা সাধারণ বাস্তবতার উপর নয়।

আমাদের বক্তব্য: بلا قيد (কোনরূপ শর্ত ছাড়াই) এ অংশ দ্বারা مقيد বিলুপ্ত হয়েছে।

مقيد- এর সংজ্ঞা: مقيد এর আভিধানিক অর্থ: উট বা অনুরূপ কোন প্রাণী যাকে বেড়ী পরানো হয়। পরিভাষায় مقيد বলা হয়:

ما دل علي الحقيقة بقيد.

“مقيد হলো যা কোন শর্তের সাথে حقيقة বা বাস্তবতার উপর প্রমাণ করে।”

যেমন আল্লাহর বানী :

৮৬. অত্র আয়াতটি যিহারের কাফফারা প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে দাস মুক্ত করতে বলা হয়েছে। এতে দাসের ক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম হওয়ার কোন শর্ত করা হয়নি।

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ.

“সে একজন মু‘মিন ক্রীতদাস মুক্ত করবে।”

আমাদের বক্তব্য: بقيد (কোন শর্তের সাথে) এ শব্দ দ্বারা مطلق বিলুপ্ত হয়েছে।

المعمل بالمطلق - মুতলাক অনুযায়ী আমল করা

মুতলাক দলীলকে শর্তহীনভাবেই আমল করা ওয়াজিব। তবে মুতলাককে مقيد করে দেয়, এমন দলীল পাওয়া গেলে, (তখন সেভাবেই আমল করতে হবে)। কেননা, কুরআন ও হাদীছের ভাষ্যের মর্মার্থ অনুযায়ী আমল করা ওয়াজীব। যতক্ষণ না তা থেকে ভিন্নতর কোন দলীল পাওয়া যায়।

যখন কোন مطلق ও مقيد ভাষ্য বর্ণিত হয়, তখন উভয়টির হুকুম একই হলে مقيد দ্বারা مطلق কে مقيد করা ওয়াজীব হবে। অন্যথায় (হুকুম এক না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন হলে) مطلق ও مقيد প্রত্যেকটি যে মর্মে বর্ণিত হয়েছে তদানুযায়ী আমল করা হবে।

مطلق ও مقيد উভয়টির হুকুম একই হওয়ায় উদাহরণ হলো যিহারের<sup>৮৭</sup> কাফফারা প্রসঙ্গে আল্লাহর বলেন,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۖ

“তাদের কাফফারা এই একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে (সূরা আল-মুজাদালাহ ৫৮:৩)।”

হত্যার কাফফারা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ.

“সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে (সূরা আন-নিসা ৪:৯২)।”

এখানে উভয় ক্ষেত্রে হুকুম একই আর তা হলো দাসমুক্ত করা। তাই ظاهر<sup>৮৮</sup> এর মুতলাক বা শর্তহীন কাফফারাকে হত্যার শর্তযুক্ত কাফফারা দ্বারা مقيد করা হবে।

৮৭. যিহার হলো স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মা, মেয়ে, কন্যা, বোন এরকম কোন মাহরাম নারীর অঙ্গের সাথে তুলনা করা।



অতএব, উভয় কাফ্‌ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে দাসের মধ্যে ঈমান থাকা শর্ত।

مطلق و مقيد উভয়টির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার উদাহরণ : আল্লাহর বাণী:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও” (সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৮)।

অপর দিকে ওয়ু সম্পর্কে তার বাণী:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

“তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো” (সূরা আল-মায়িদা ৫:৬)।

এখানে উভয় ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটি হাত কাটা আর দ্বিতীয়টিতে হাত ধোয়া। কাজেই দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রথমটি মকিদ করা যাবে না। বরং এটি مطلق এর উপরই বহাল থাকবে। সুতরাং হাত কাটার বিধানটি কবজি পর্যন্ত হবে আর হাত ধোয়ার বিধান কনুই পর্যন্ত হবে।<sup>৮৮</sup>

### اجمل والمبين দ্ব্যর্থবোধক ও দ্ব্যর্থহীন।

محمل এর আভিধানিক অর্থ: অস্পষ্ট, ব্যাখ্যাহীন, সামষ্টিক ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ:

ما يتوقف فهم المراد منه علي غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره.

৮৮. অর্থাৎ প্রথম হাত কাটার বিধানটি মূলতাক বা শর্তহীন ভাবে এসেছে। আয়াতে উল্লেখ নাই হাত কোন পর্যন্ত কাটতে হবে। পরের আয়াতে হাত ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে মুকাইয়্যাদ বা শর্তযুক্ত ভাবে। অর্থাৎ কনুই পর্যন্ত। এখানে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা প্রথম আয়াতকে শর্তযুক্ত করে বলা যাবে না যে, হাত কনুই পর্যন্ত কাটতে হবে। কেননা, উভয় আয়াতের হুকুম আলাদা। প্রথম আয়াতে হাত কাটা আর দ্বিতীয় আয়াতে হাত ধোয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই উভয় আয়াতকে আলাদা আলাদা ভাবে আমল করতে হবে। দ্বিতীয় আয়াত অনুসারে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া হবে। হাদীছের নির্দেশনা অনুসারে কজি পর্যন্ত হাত কাটা হবে।

অর্থাৎ **مَجْمَل** ঐ শব্দকে বলে যার উদ্দিষ্ট বুঝ অন্যের উপর নির্ভর করে। হয়তো তার সত্ত্বা নির্ধারণ অথবা তার সিফাত বর্ণনা অথবা তার পরিমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে।

সত্ত্বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যা অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় এর উদাহরণ: আল্লাহর বাণী:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“তালাক প্রাপ্তা নারীরা তিন হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (সূরা আল-বাক্বারা ২:২২৮)।”

কেননা, **قُرُوء** শব্দটি **حيض** ও **طهر** উভয় অর্থের সমষ্টি। কাজেই এর মধ্যে যে কোন একটি নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে ভিন্ন দলীলের প্রয়োজন।

**صفة** এর বিবরণ জানার জন্য যা অন্যের উপর নির্ভরশীল, এর দৃষ্টান্ত: আল্লাহর বাণী:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করো (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)।

এখানে ছালাত প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতি অজ্ঞাত, যার বিবরণ জানা প্রয়োজন।

পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ার ক্ষেত্রে যা অন্যের মুখাপেক্ষী, এর উদাহরণ:

وَأَتُوا الرِّكَاتَ

“তোমরা যাকাত প্রদান করো (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)।”

এখানে যাকাতের নিসাব অজ্ঞাত, যার বিবরণ প্রয়োজন।

**مبين** এর সংজ্ঞা: **مبين** এর আভিধানিক অর্থ: স্পষ্ট, ব্যাখ্যাকৃত। **مبين** এর পারিভাষিক অর্থ:

ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين

“যে শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝা যায়, হয়তো মূল সৃষ্টিগতভাবে অথবা বর্ণনা করার পর, তাকে **مبين** বলে।”

যার উদ্দিষ্ট মর্মার্থ মূল সৃষ্টিগতভাবে বুঝা যায়, এর উদাহরণ: আসমান, জমিন, পাহাড়, মানুষ, জুলুম, সততা ইত্যাদি এ ধরনের শব্দগুলির উদ্দিষ্ট মর্মার্থ মূল সৃষ্টিগত ভাবেই জানা যায়। এদের অর্থের বিবরণের জন্য এ শব্দসমূহ অন্য শব্দের মুখাপেক্ষী হয় না।

যে শব্দের উদ্দিষ্ট মর্মার্থ স্পষ্ট করার পর বুঝা যায়-এর উদাহরণ: আল্লাহর বাণী:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করো যাকাত দাও (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)।

এখানে إقامة (প্রতিষ্ঠা করো) ও ايتاء (প্রদান করো) উভয়টি جمل শব্দ। কিন্তু শরীয়ত প্রণেতা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তাই বর্ণনা করার পর সেটি মبین শব্দে পরিণত হয়েছে।

جمل অনুযায়ী আমল করা

مكلف বিবরণ-ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে শরীয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য আবশ্যিক হলো جمل অনুযায়ী আমল করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

নারী ছা। শরীয়তের মৌলিক-শাখাগত সমস্ত বিষয় তাঁর উম্মতের জন্য সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি এ উম্মতকে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন শরীয়তের উপর রেখে গিয়েছেন; যার রাত দিবালোকের মতই। তিনি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কখনও বিবরণ দেওয়া ছেড়ে দেননি।

তার বিবরণ হয়তো বা বাচনিক কথা অথবা কর্মের মাধ্যমে হয়, অথবা কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে হয়।

কথার মাধ্যমে বিবরণের উদাহরণ: যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া। যেমন তিনি বলেছেন:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشِيرَ

বৃষ্টির পানিতে যে শয্য উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ ওশর দিতে হবে।”

এটি হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত جمل বাণীর بیان বা ব্যাখ্যা।

## وَأَتُوا الزَّكَاةَ

তোমরা যাকাত প্রদান করো (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)।

কর্মের মাধ্যমে বিবরণ দেওয়ার উদাহরণ: উম্মতের সামনে হজ্জের কার্যক্রম সম্পন্ন করা; এটি আল্লাহর নিচের جَمَل (ব্যাক্যাহীন) আয়াতের ব্যাখ্যা। আল্লাহর বাণী:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

“এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য যে লোকের সামর্থ রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার।”

অনুরূপতা নাবী ছা. কর্তৃক صلوٰة الكسوف বা সূর্য গ্রহণের ছালাত যথা-নিয়মে সম্পন্ন করা। এটি বাস্তবে তার নিম্নোক্ত جَمَل (ব্যাক্যাহীন) বাণীর ব্যাখ্যা। তিনি বলেছেন:

فاذا رايتم منها شيئا فصلوا

“যখন তোমরা তাতে কোন কিছু হতে দেখবে, তখন ছালাত আদায় করবে।”<sup>৮৯</sup>

কথা ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যার উদাহরণ: ছালাত আদায়ের পদ্ধতির বিবরণ। কেননা, এ বিবরণ কথার মাধ্যমে হয়েছিলো। যেমন: ছালাতে ভুলকারী সম্পর্কে হাদীছে রসূল বলেছেন,

...إذا قمتم الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

‘যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াতে ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন পরিপূর্ণ ভাবে ওয়ু করবে। তারপর কেবলা মুখী হয়ে আল্লাহ্ আকবার বলবে।’<sup>৯০</sup>

আবার তার কর্মের মাধ্যমেও এর বিবরণ হয়েছিল। যেমন: সাহল বিন সা’দের হাদীছে রয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহর রসূল ছা. মিস্বারে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাকবীর দিলেন এবং তার পেছনে লোকজনও তাকবীর দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি মিস্বারের উপর ছিলেন...’ অত্র হাদীছে আরো আছে, তারপর তিনি লোকদের অভিমুখী হলেন এবং বললেন: আমি এ রকম করলাম, যাতে তোমরা আমার অনুসরণ করতে পারো এবং আমার ছালাত তোমরা শিখে নিতে পারো।

৮৯. ছহীহ বুখারী হা/৫৭৮৫, ছহীহ মুসলিম হা/৯১১।

৯০. ছহীহ বুখারী হা/৬২৫১, ছহীহ মুসলিম হা/৩৯৭, ইবনে মাজাহ হা/১০৬০।

## الظاهر والمؤول (জাহের ও মুআওয়াল)<sup>৯১</sup>

الظاهر এর আভিধানিক অর্থ: স্পষ্ট, প্রকাশমান। পারিভাষিক অর্থ:

ما دل بنفسه علي معني راجح مع احتمال غيره

“الظاهر হলো যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে অগ্রগণ্য অর্থের উপর প্রমাণ করে। যদিও সেখানে ভিন্ন অর্থ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।” এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছা. এর বাণী:

توضؤوا من حوم الابل

“উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওয়ু করবে।”<sup>৯২</sup>

এখানে ‘ওয়ু’ দ্বারা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে الظاهر হলো শারঈ নিয়মে চার অঙ্গ ধৌত করা। ঐ وضوء উদ্দেশ্য নয়, যার অর্থ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা।

আমাদের বক্তব্য: ما دل بنفسه علي معني (যা স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে কোন অর্থের উপর প্রমাণ করে) এ অংশ দ্বারা مجمل বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, مجمل স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে অর্থের উপর প্রমাণ করতে পারে না।

راجح (অগ্রগণ্য) এ শব্দ দ্বারা المؤول বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, পূর্বাপর ইঙ্গিত না থাকলে المؤول শব্দ مرجوح অর্থের উপর প্রমাণ করে।

---

৯১. যে শব্দ শুধুমাত্র একটি অর্থ প্রদান করে। একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে না, তাকে النص বলে। পক্ষান্তরে যে শব্দ একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে, তাকে المشترك বলে। অতঃপর একাধিক অর্থের মাঝে মুজতাহিদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে একটিকে অগ্রাধিকার দেন, সেটাকে الظاهر বলে। আর যে অর্থের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাকে বলে المؤول

৯২. মুসনাদে আহমাদ; ৪/৩৫২, আবু দাউদ/১৮৪, ছহীহ মুসলিম/৩৬০।

مع احتمال غيره (যদিও সেখানে ভিন্ন অর্থ সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে) সর্বশেষ এ অংশ দ্বারা نص বা সুস্পষ্ট ভাষ্য বিলুপ্ত হয়েছে। কেননা, نص কেবল একটি অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে।

الظاهر অনুযায়ী আমল করা প্রসঙ্গে:

الظاهر অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। তবে যদি এমন দলীল পাওয়া যায়, যা তাকে ظاهر বা বাহ্যিক অর্থ থেকে সরিয়ে দেয়, তাহলে ঐ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অর্থই গ্রহণ যোগ্য হবে। কেননা, এটাই হলো সালাফ বা পূর্ববর্তী বিদ্বানদের কর্মপন্থা যা বেশি সতর্কতা মূলক এবং দায়িত্ব মুক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী। এবং ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী পন্থা।

المؤول এর সংজ্ঞা:

المؤول শব্দটি আভিধানিক ভাবে أول থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ: প্রত্যাবর্তন করা।

পারিভাষিক অর্থ:

ما حمل لفظه علي المعني المرجوح

مرجوح বা অগ্রগণ্য অর্থের উপর কোন শব্দের প্রয়োগ করাকে المؤول বলে।

আমাদের বক্তব্য: علي المعني المرجوح (অগ্রগণ্য অর্থের উপর অন্য শব্দের প্রয়োগ) এ অংশ দ্বারা نص ও الظاهر বের হয়ে গেছে। نص বের হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু এটি কেবল একটি অর্থেরই সম্ভাবনা রাখে। الظاهر বের হয়ে গেছে। কারণ এটি راجح অগ্রগণ্য অর্থের উপর ব্যবহৃত হয়।

التأويل দু'প্রকার। যথা:

(১) গ্রহণযোগ্য ছহীহ তা'বীল (ব্যাখ্যা)।

(২) প্রত্যাখ্যাত ফাসেদ-ভুল তা'বীল (ব্যাখ্যা)।

التأويل الصحيح (ব্যাখ্যা) এর উপর বিশুদ্ধ দলীল রয়েছে সেটাই হলো التأويل الصحيح।

যেমন: আল্লাহর বাণী:

## وَسَّئِلِ الْقَرْيَةِ

জিজেস করন জনপদকে (জনপদের অধিবাসীকে) (সূরা ইউসূফ ১২:৮২) ।

এখানে وَسَّئِلِ الْقَرْيَةِ (জিজেস করন জনপদকে) আমরা ব্যাখ্যা করি اهل القرية (জিজেস করন জনপদের অধিবাসীকে) এর মাধ্যমে । কেননা, স্বয়ং জনপদকে প্রশ্ন করা সম্ভব নয় ।

الفساد التأويل (ভ্রান্ত ব্যাখ্যা) হলো ঐ তাবীল যার স্বপক্ষে বিশুদ্ধ কোন দলীল নেই ।  
যেমন: আল্লাহর বাণী:

## الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

দয়াময় আল্লাহ আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন (সূরা ত্বা-হা ২০:৫) ।”

বাতিলপন্থীরা উক্ত আয়াতের اسْتَوَىٰ এর অর্থ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে বলেন, এর অর্থ হলো কর্তৃত্ব লাভ করা । কিন্তু সঠিক অর্থ হলো সমুন্নত হওয়া, অধিষ্ঠিত হওয়া । তবে এসবের কোন ধরণ বর্ণনা করা বা উপমা দেওয়া যাবে না ।

## النسخ (রহিতকরণ)

النسخ এর সংজ্ঞা:

এর আভিধানিক অর্থ:- দূর করা, স্থানান্তর করা। পারিভাষিক অর্থ :

رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة

النسخ হলো কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে শারঈ কোন দলীলের হুকুম বা শব্দ উঠিয়ে দেওয়া।

আমাদের বক্তব্য: رفع حكم এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুকুম পরিবর্তন করা। উদাহরণ স্বরূপ: ওয়াজিব থেকে মুবাহ অথবা মুবাহ থেকে হারামে পরিবর্তন করা।

সুতরাং এর দ্বারা ঐ হুকুম বের হয়ে গেলো, যে হুকুম কোন প্রতিবন্ধকতা থাকার কারণে অথবা শর্ত না পাওয়ার কারণে বিলম্বিত হয়। যেমন: নিসাব পরিমাণ সম্পদের ঘাটতির কারণে যাকাত প্রদানের ফরজিয়াত-আবশ্যিকতা উঠে যাওয়া অথবা হায়েজ অবস্থায় ছালাতের ফরজিয়াত উঠে যাওয়া। অতএব, এগুলোকে النسخ হিসেবে অভিহিত করা হবে না।

আমাদের বক্তব্য: لفظه অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শারঈ দলীলের শব্দ। কেননা, النسخ হয়তো বা শব্দের না হয়ে হুকুমের হয় অথবা তার বিপরীত হয়, অর্থাৎ হুকুম রহিত না হয়ে শুধু শব্দ রহিত হয়, অথবা শব্দ ও হুকুম উভয়টিই রহিত হয়, যার বিবরণ অচিরেই আসছে।

আমাদের বক্তব্য: بدليل من الكتاب والسنة (কুরআন ও হাদীছের দলীলের মাধ্যমে) এ অংশ দ্বারা এ দুটি ছাড়া অন্যান্য দলীল যেমন: ইজমা ও ক্বিয়াস, বের হয়ে গেছে। সুতরাং এগুলি দ্বারা النسخ সাব্যস্ত হবে না।



## النسخ বা রহিতকরণ এর যৌক্তিকতা

জ্ঞানগত বিচারে ‘রহিতকরণ’ হওয়া সম্ভব এবং শারঈ ভাবেও এটি বাস্তব সম্মত বিষয়।

‘রহিতকরণ’ জ্ঞানগত ভাবে সম্ভব হওয়ার যৌক্তিকতা হচ্ছে যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার হাতেই রয়েছে সমস্ত জিনিসের চাবিকাঠি।

বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল তারই। কারণ তিনিই প্রতিপালক, অধিপতি। কাজেই তার এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি তার প্রজ্ঞা ও রহমতের দাবি অনুসারে বান্দার জন্য শারঈ বিধান দেন।

বাদশা তার প্রজাকে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নির্দেশ দিবেন এটা কি বিবেক বাঁধা দেয়?

উপরন্তু বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও হিকমতের দাবি হলো, তিনি তাদের জন্য এমন শারঈ বিধান প্রণয়ন করবেন, যে ব্যাপারে তিনি জানেন যে, এতে তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে। আর কল্যাণ অবস্থা ও সময় ভেদে বিভিন্ন হয়। কাজেই কোন হুকুম একটি সময়ে বা অবস্থায় বান্দার জন্য অধিকতর কল্যাণ বিবেচিত হয়, আবার অন্য সময় বা অবস্থার প্রেক্ষিতে আরেকটি হুকুম তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর বিবেচিত হতে পারে। তিনি সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ।

শারঈ এর বাস্তবতার দলীল হলো (১) আল্লাহ বাণী:

مَا نُنَسِّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

“আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি (সূরা আল-বাক্বারা ২:১০৬)।”

(২) আল্লাহর বাণী:

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

“এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)।”

فَالْآنَ بَاشِرُوهُمْ

“অতএব, এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে (রমজানের রাতে) সহবাস করতে পারো (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৭)।”

এগুলি পূর্বের হুকুম পরিবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল।

(৩) রসূল ছা. এর বাণী:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা যিয়ারত করবে।” ৯৩

অত্র হাদীছটি ‘কবর যিয়ারতের নিষেধাজ্ঞা’ রহিত হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল।

যা ‘রহিত হওয়া’ নিষিদ্ধ:

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রহিত হওয়া নিষিদ্ধ:

(১) বিবরণসমূহ। কেননা, রহিত হওয়ার ক্ষেত্র হলো হুকুম। আর দু’ বিবরণের একটি রহিত হলে, এর যেকোন একটি মিথ্যা হওয়া অবধারিত হয়। আল্লাহ ও তার রসূলের বর্ণনাসমূহে মিথ্যা থাকা অসম্ভব। তবে যদি কোন হুকুম خبر এর আকৃতিতে আসে, তাহলে সেটি রহিত হওয়া নিষিদ্ধ নয়। যেমন, আল্লাহর বাণী:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

“যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে, তবে তারা দু’শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৫)।”

এটি বর্ণনামূলক হলেও এর অর্থ নির্দেশমূলক। এ জন্য পরের আয়াতে এটি রহিত হওয়ার বিধান বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন,

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। এতএব তোমাদের মাঝে একশত জন মুজাহিদ থাকলে, তারা দু’শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)।”

(২) ঐ সমস্ত বিধি-বিধান যা সর্বাবস্থায় সর্বদা কল্যাণকর। যেমন: আল্লাহর একত্ব, ঈমানের মৌলিক বিষয়, ইবাদতের মৌলিক বিষয়, সততা, নিষ্কলুষতা, সচ্চরিত্র, বদান্যতা ও বীরত্ব প্রভৃতি রহিত হওয়া সম্ভব নয়।

অনুরূপভাবে যে সব জিনিস সর্বদা মন্দ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে নিষিদ্ধ, সেগুলিও রহিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন: শিরক, কুফর, পাপাচারিতা, মিথ্যা, মন্দচরিত্র, কপণতা ও ভীর্ণতা ইত্যাদি। কারণ সম্পূর্ণভাবে বান্দার কল্যাণ সাধন এবং তাদের জন্য ক্ষতিকর এমন জিনিস থেকে বিরত রাখার জন্য শরীয়াত প্রণীত হয়েছে।

### نسخ ‘রহিতকরণ’ এর শর্তসমূহ:

যে সব ক্ষেত্রে نسخ সম্ভব, সে সব ক্ষেত্রে نسخ বা ‘রহিতকরণ’ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হওয়া। তাই উভয় দলীলের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে, উভয়টি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হওয়ার কারণে نسخ সাব্যস্ত হবে না।

(২) نسخ বা রহিতকারী দলীল পরে আসার ব্যাপারে জানা থাকা। এটি জানা যেতে পারে মূল দলীলের মাধ্যমে অথবা ছাহাবীর সংবাদের মাধ্যমে অথবা ইতিহাসের মাধ্যমে।

‘দলীল পরে আসার’ বিষয়টি نص এর মাধ্যমে জানা যায়। এর উদাহরণ হলো: রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة

“আমি তোমাদের জন্য নারীদের সাময়িক বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। আল্লাহ তায়ালা এটাকে ক্রিয়ামত অবধি হারাম করে দিয়েছেন।” ৯৪

ছাহাবীর সংবাদে মাধ্যমে জানার উদাহরণ হলো আয়েশা (রা.) এর বক্তব্য:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ . ثُمَّ نَسَخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ

“কুরআন থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে এটাও ছিল যে, দশ চোষণ দুধ পান করা হুরমাত সাব্যস্ত করে। এরপর নির্দিষ্ট পাঁচ চোষণের মাধ্যমে তা রহিত হয়ে যায়।” ৯৫

ইতিহাস দ্বারা জানার উদাহরণ হলো: আল্লাহর বাণী:

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ

“এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)।”

আয়াতের اَلَّذِينَ (এখন) শব্দটি এ হুকুম পরে আসার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।

অনুরূপভাবে যদি উল্লেখ করা হয় যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পূর্বে কোন বিষয়ে হুকুম দিয়েছেন। তারপর হিজরতের পরে তার বিপরীত ফয়সালা দিয়েছেন। তখন দ্বিতীয়টি ‘রহিতকারী’ সাব্যস্ত হবে।

(৩) ناسخ বা ‘রহিতকারী দলীল’ ছহীহ হওয়া: এক্ষেত্রে অধিকাংশ বিদ্বান শর্ত করেছেন যে, রহিতকারী দলীল ‘রহিতব্য’ দলীলের চেয়ে শক্তিশালী অথবা সমমানের হতে হবে। কাজেই তাদের মতে, মুতাওয়াতির হাদীছ খবরে ওয়াহেদ হাদীছ দ্বারা রহিত হবে না। যদিও রহিতকারী দলীলটি ছহীহ হয়।

কিন্তু অধিকতর অগ্রগণ্য মত হলো نسخ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য نسخ কে অধিকতর শক্তিশালী কিংবা সমমানের হওয়া শর্ত নয়। কেননা, نسخ এর ক্ষেত্র হলো হুকুম আর হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুতাওয়াতির হওয়া শর্ত নয়।

النسخ এর প্রকারভেদ:

৯৪. ছহীহ মুসলিম হা/১৪০৬, মুসনাদে আহমাদ

৯৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৪৫২

النسخ তিন প্রকার। যথা:

প্রথম প্রকার: হুকুম মানসুখ-রহিত হয় কিন্তু তার শব্দ বহাল থাকে। কুরআনের এ ধরনের نسخ বেশী। এর উদাহরণ হলো: ايتا المصايرة বা ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করা সম্পর্কিত আয়াতদ্বয়। আয়াত দু'টি হলো:

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ

“যদি তোমাদের মাঝে বিশ জন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে, তবে তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)।”

অত্র আয়াতের হুকুম নিচের আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে।

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“এখন আল্লাহ তোমাদের উপর বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। আর তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে দুর্বলতা রয়েছে। এতএব, তোমাদের মাঝে একশত জন মুজাহিদ থাকলে, তারা দু'শত জনের মোকাবেলায় জয়ী হবে (সূরা আল-আনফাল ৮:৬৬)।”

শব্দ রহিত না করে হুকুম রহিত করার হিকমত হলো: তিলাওয়াতের ছাওয়াব অবশিষ্ট রাখা এবং জাতীকে نسخ এর হিকমত-তাৎপর্য স্মরণ করিয়ে দেয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: শব্দ রহিত হয়, তবে হুকুম বহাল থাকে।

যেমন: রজম (বিবাহিত ব্যভিচারী নর-নারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা) বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আয়াত। ছহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের সূত্রে প্রমাণিত যে, উমার রা. বলেন, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তন্মধ্যে রজম সংশ্লিষ্ট আয়াত ছিলো। আমরা সেই আয়াত পড়েছি, বুঝেছি ও মুখস্থ করেছি। রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অনুযায়ী রজম করেছেন। পরবর্তীতে আমরাও রজম করেছি।

উপরন্তু আমার আশংকা হয়, দীর্ঘ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কেউ হয়তো বলবে, ‘আলাহর কসম আমরা তো কুরআনে রজমের আয়াত পাচ্ছি না!’ ফলে আল্লাহর নায়িলকৃত একটি ফরয বর্জন করার কারণে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর

কিতাবে রজম যথার্থ সে সব নারী-পুরুষের জন্য, যারা বিবাহিত হওয়ার পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা গর্ভবতী হয় অথবা স্বীকার করে।

হুকুম রহিত না করে শব্দ রহিত করার হিকমত-তাৎপর্য হলো যে আমলের শব্দ কুরআনে পাওয়া যায় না, তদানুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে উম্মাহকে পরীক্ষা করা এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে বিষয়ে তাদের ঈমান যাচাই করা। এক্ষেত্রে ইহুদিদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, তারা তাওরাতে রজম সংশ্লিষ্ট نص কে গোপন করার চেষ্টা করেছিলো।

তৃতীয় প্রকার: শব্দ ও হুকুম উভয়টি রহিত হওয়া। যেমন: দশ চোষণ সম্পর্কিত আয়েশা রা. বর্ণিত পূর্বের হাদীছটির ‘রহিতকরণ’।

ناسخ বা রহিতকারী দলীলের দিক দিয়ে النسخ চার প্রকার। যথা:

প্রথম প্রকার: কুরআন দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া। এর উদাহরণ হলো ধৈর্যের সাথে কাফেরদের মোকাবেলা সম্পর্কিত আয়াতদ্বয়।<sup>৯৬</sup>

দ্বিতীয় প্রকার: হাদীছ দ্বারা কুরআন রহিত হওয়া। আমি এর স্বপক্ষে ত্রুটিমুক্ত কোন দলীল পাইনি।

তৃতীয় প্রকার: কুরআন দ্বারা হাদীছ রহিত হওয়া। উদাহরণ হলো হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করার বিধান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর দ্বারা সাব্যস্ত কা’বার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করার বিষয়ের মাধ্যমে রহিতকরণ। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ

“এখন আপনি মাসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৪৪)।”

চতুর্থ প্রকার: এক হাদীছ দ্বারা অপর হাদীছ রহিত করা। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

كنت نهيتكم عن البيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا

“আমি তোমাদেরকে পানির পাত্রে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা যে কোন নাবীয তৈরী করে তা পান করতে পারো। তবে নেশা দ্রব্য কোন কিছুর পান করবে না।”<sup>৯৭</sup>

### النسخ এর হিকমত:

‘রহিতকরণ’ এর অনেক হিকমত-তাৎপর্য রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো

(১) বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার জন্য অধিকতর উপকারী শরীয়ত প্রণয়নের মাধ্যমে তাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা।

(২) শরীয়ত প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের পন্থা অবলম্বন করা, যাতে তা ক্রমান্বয়ে পূর্ণতায় পৌছতে পারে।

(৩) এক হুকুম থেকে পরিবর্তন করে অন্য হুকুম গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকা এবং তাতে সম্ভূষ্ট থাকার ব্যাপারে مكلف দেব পরীক্ষা করা।

(৪) রহিত করণ সাধিত হয়ে তুলনামূলক সহজ বিধান আসলে শুকরিয়া আদায় করা এবং তুলনামূলক কঠিন বিধান আসলে তাতে ধৈর্য্য ধারণ করার ব্যাপারে مكلف দেব পরীক্ষা করা।

---

৯৭. ছহীহ মুসলিম/৯৭৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ২১২৯, মুসনাদে আহমাদ (৩/২৩৭/১৩৫১২), আবু ইয়ালা (৬/৩৭৩/৩৭০৭), আল্লামা হায়সামী তার ‘মাজমাউয যাওয়ায়েদ’ (৫/৬৬) গ্রন্থে বলেন, এ হাদীছের সনদে ইয়াহইয়া বিন আব্দুল্লাহ আল জাবির রয়েছে। তাকে অধিকাংশ বিদ্বান দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার কোন সমস্যা নেই। সনদের অন্যান্য রাবী নির্ভরযোগ্য।

## খবরসমূহ (الأخبار)

খبر এর সংজ্ঞা: خبر এর আভিধানিক অর্থ: সংবাদ দেয়া।

এখানে খবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন কথা, কাজ, অনুমোদন অথবা গুণাগুণ- যা রসূল ছাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।<sup>৯৮</sup>

কথা বা বাণী সম্পর্কে অনেক বিধি বিধান চলে গিয়েছে। অতঃপর এখন আলোচনা হবে তার কর্ম সম্পর্কে। রসূল ছাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্ম বিভিন্ন ধরনের।

প্রথম প্রকার: প্রকৃতির চাহিদানুসারে যে কর্ম তিনি পালন করেছেন। যেমন: খাওয়া, পান করা, ঘুমানো প্রভৃতি। এসব কর্মের ব্যাপারে সত্তাগতভাবে কোন হুকুম নেই। তবে কোন কারণ বশতঃ এসব আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ হতে পারে। আবার অনেক সময় এদের পালনীয় বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে। যেমন: ডান হাতে খাওয়া। অথবা নিষিদ্ধ বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে। যেমন: বাম হাতে খাওয়া।

দ্বিতীয় প্রকার: অভ্যাসগতভাবে তিনি যা করেছেন। যেমন: পোশাকের বৈশিষ্ট্য। এগুলি সত্তাগতভাবে মুবাহ বা বৈধ। তবে কারণ বশতঃ এগুলি আদিষ্ট বা নিষিদ্ধ হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার: যে সব কর্ম তিনি খাছভাবে পালন করেছেন। এগুলো কেবল তার জন্যই খাছ হবে। যেমন: একাদিক্রমে সিয়াম রাখা, কোন মহিলা নিজেকে উৎসর্গ করলে তাকে বিবাহ করা প্রভৃতি।

দলীল ছাড়া কোন কর্মকেই তার জন্য خاص হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না। কেননা তার কর্মের ব্যাপারে শরীয়াতে মূলনীতি হলো তার অনুসরণ করা।

চতুর্থ প্রকার: যা তিনি ইবাদত হিসাবে পালন করেছেন। এক্ষেত্রে তার উপর ওয়াজিব হলো তা পালন করা, যাতে করে আমলটির প্রচার হয়। কেননা, এগুলো প্রচার করা তার উপর ওয়াজিব।

৯৮. এ সংজ্ঞা অনুসারে খবর ও হাদীছ সমার্থবোধক শব্দ।



অতঃপর তা পালন করা অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে, আমাদের এবং তার জন্য বাধ্যনীয়। এটি এজন্য যে, ইবাদত হিসেবে তার কর্মপালন, কর্মটি শরীয়াতসিদ্ধ হওয়ার উপর প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে আরো মূলনীতি হলো, তা বর্জন করার জন্য শাস্তি না হওয়া। কাজেই সেটি এমন শরীয়াতসিদ্ধ বিষয় হিসাবে গণ্য হবে, যা বর্জনে শাস্তি নেই। এটিই হলো মানদুব কর্মের বাস্তব অবস্থা।

এর দৃষ্টান্ত হলো আয়েশা রা. এর বর্ণিত হাদীছ। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাড়ীতে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি প্রথমে কি করতেন? তিনি বলেন: ‘মিসওয়াক করতেন’।<sup>৯৯</sup>

বাড়ীতে প্রবেশের সময় মিসওয়াক করার ব্যাপারে শুধুমাত্র তার কর্মই পাওয়া যায়। কাজেই এটি মানদুব (পালনীয়) হিসাবে গণ্য হবে।

আরো একটি উদাহরণ হলো, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উষু করার সময় দাড়ি খেলাল করতেন।<sup>১০০</sup> আর দাড়ি খেলাল করা চেহারা ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত নয় যে, সেটি ব্যাখ্যাহীন বিষয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য হবে। এটা কেবল তার কর্ম। কাজেই এটি মানদুব হিসাবে গণ্য হবে।

পঞ্চম প্রকার: কুরআন অথবা হাদীছের **مَجْمُوع** বা ব্যাখ্যাহীন বিষয়ের **بَيَان** বা ব্যাখ্যা হিসাবে যে কাজ তিনি সম্পন্ন করেছেন। এমন কাজ পালন করা তার উপর আবশ্যিক, যাতে মানুষের নিকট কর্মটির ব্যাখ্যা অর্জিত হয়। যেহেতু এমন কর্মের প্রচার করা তার উপর ওয়াজিব।

অতঃপর তার ও আমাদের জন্য এমন কর্মের হুকুম হিসেবে ব্যাখ্যাকৃত **نَص** এর হুকুমই সাব্যস্ত হবে। যদি **نَص** এর হুকুম, ওয়াজিব হয়, তাহলে এ কর্মটিও ওয়াজিব হবে। **نَص** এর হুকুম মানদুব হলে, কর্মটির হুকুমও মানদুব হবে। ওয়াজিবের উদাহরণ হলো ফরয ছালাতের কর্মসমূহ, যা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত মুজমাল আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে পালন করেছেন। আল্লাহর বাণী:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

‘তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা করো (সূরা আল-বাক্বারা ২:৪৩)।’

৯৯. ছহীহ মুসলিম হা/২৫৩

১০০. তিরমিযী হা/২৯-৩০, ইবনু মাজাহ হা/৪২৯

মানদুবের উদাহরণ হলো: বাইতুল্লাহ তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর মাকামে ইবরাহীমের পিছনে তার দু'রাকাত ছালাত আদায় করা।<sup>১০১</sup> তার এ ছালাত আদায় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আল্লাহর বাণী:

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ

“তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে) ছালাতের জায়গা হিসাবে গ্রহণ করো (সূরা আল-বাক্বার ২:১২৫)।”

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াতটি পাঠ করতে করতে মাকামে ইবরাহিমে আগমন করেছিলেন। এর পিছনে ছালাত আদায় করা সুন্নাত।

কোন কিছুর ব্যাপারে তার স্বীকৃতি, সেটি জায়েয হওয়ার দলীল। তবে সেটি ঐ পদ্ধতিতে জায়েয হবে, সে পদ্ধতির উপর তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। চাই সেটি কথা হোক বা কর্ম হোক।

কোন কথার উপর তার স্বীকৃতি দেয়ার উদাহরণ হলো: ঐ দাসীর কথাকে স্বীকৃতি দেওয়া, যাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আল্লাহ কোথায়?’ দাসী বলেছিলো, ‘আসমানে’।<sup>১০২</sup>

কোন কর্মের ব্যাপারে তাঁর স্বীকৃতি দেয়ার উদাহরণ :একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের সেনাধ্যক্ষের কর্মের স্বীকৃতি। যিনি তার অধীনস্থ ছাহাবীদের নিয়ে ছালাতে কিরা'আত শেষে সূরা ইখলাস পড়তেন। আল্লাহর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করো, সে কেন এমন করে থাকে?’ অতঃপর লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন, যেহেতু সূরাটিতে আল্লাহর হিফাত বর্ণিত হয়েছে, এজন্যই আমি এটি পড়তে ভালবাসি। নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহও তাঁকে ভালবাসেন।<sup>১০৩</sup>

আরো একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো: হাবশীদের ইসলামে উদ্ধুদ্ধ করার জন্য মসজিদে তাদের খেলাধুলা করার স্বীকৃতি দেওয়া।<sup>১০৪</sup>

১০১. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮

১০২. ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭

১০৩. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৭৫, ছহীহ মুসলিম হা/৮১৩।

১০৪. ছহীহ বুখারী হা/৪৫৪

অতঃপর যে সব কর্ম তাঁর যামানায় সংঘটিত হয়েছে অথচ তিনি তা জানেন নি। সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকে তাঁর দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। তবে উক্ত কর্মসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার সম্মতি থাকার কারণে তা দলীল হিসাবে গণ্য হবে। এজন্য ছাহাবীরা আযল<sup>১০৫</sup> জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের আযল করার উপর আল্লাহর সম্মতিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। জাবির রা. বলেন, আমরা আযল করতাম এমতাবস্থায় যে তখন কুরআন নাযিল হতো।<sup>১০৬</sup>

ইমাম মুসলিম বর্ধিতভাবে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, যদি এটি নিষিদ্ধ হওয়ার মত কোন বিষয় হতো, তবে কুরআন আমাদেরকে অবশ্যই তা নিষেধ করে দিতো।

এ ব্যাপারে আল্লাহর সম্মতি রয়েছে তার দলীল-প্রমাণ হলো, মুনাফিকরা যে সব জঘন্য কর্ম গোপন করতো, আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা যে সব কর্মের ব্যাপারে নিরব থেকেছেন তা জায়েয কর্ম।

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্পর্কিত ‘চারিত্রিক গুণের’ দৃষ্টান্ত হলো:

كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس

“রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশী দানশীল এবং সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ ছিলেন।”

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্পর্কিত আকৃতিগত গুণের দৃষ্টান্ত হলো নিচের হাদীছ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الناس ليس بالطويل ولا بالقصير

রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম আকৃতির মানুষ ছিলেন। খুব বেশী লম্বা ছিলেন না; আবার খাটোও ছিলেন না।”

১০৫. আযল হলো স্ত্রীর সাথে যথারীতি মিলন করে বীর্যপাতের ঠিক পূর্বক্ষণে স্ত্রীর যোনী থেকে পুরুষাঙ্গ বের করে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো। সাধারণভাবে এ আযল করা মাকরুহ বা নিন্দনীয়। তবে প্রয়োজনীয় অবস্থায় তা জায়েয বলে গণ্য হবে।

১০৬. ছহীহ বুখারী /৫২০৭, ছহীহ মুসলিম /১৪৪০।

খবরকে যাদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাদের বিবেচনায় এর প্রকারভেদ:

খবর যাদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাদের বিবেচনায় তিন প্রকার। যথা:

(১) মারফু: যে খবরকে বাস্তবিকভাবে অথবা বিধানগত ভাবে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাকে মারফু বলে।

বাস্তবিকভাবে মারফু হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও তাঁর অনুমোদন।

বিধানগত ভাবে মারফু হলো যে সব কর্মকে তাঁর সুন্নাতের দিকে অথবা তাঁর যামানার দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, যেগুলি সরাসরি তাঁর সম্পৃক্ততার উপর প্রমাণ করে না। এর অন্যতম হলো ছাহাবীদের এরকম বলা ‘আমাদের আদেশ করা হয়েছে বা নিষেধ করা হয়েছে’ অথবা এ জাতীয় শব্দ বলা। যেমন: আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের কথা:

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض

“লোকদেরকে আদেশ দেওয়া হয় যে, হজ্জে তাদের শেষ কর্ম যেন তাওয়াফ করা হয়। তবে তিনি এ বিধানটি ঋতুবতী মহিলাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন।”<sup>১০৭</sup>

অনুরূপভাবে উম্মু আতিয়্যার কথা:

فمينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

“আমাদেরকে জানাযায় অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কড়াকড়ি ভাবে বলা হয়নি।”<sup>১০৮</sup>

(২) মাওকুফ: যে হাদীছ ছাহাবীদের দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয় এবং মারফু এর হুকুম সাব্যস্ত করা হয় না, তাকে মাওকুফ হাদীছ বলে। এটি অগ্রগণ্য মতানুসারে দলীল হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে এটি যদি কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে কিংবা অপর কোন ছাহাবীর বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে ভিন্ন হুকুম হবে। কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে বিরোধপূর্ণ হলে, কুরআন ও হাদীছের স্পষ্ট বর্ণনা গ্রহণ করা হবে। আর অন্য ছাহাবীর বক্তব্যের সাথে বিরোধপূর্ণ হলে, অগ্রাধিকারযোগ্য মতটি গ্রহণ করা হবে।

১০৭. ছহীহ বুখারী হা/১৭৫৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৩২৮।

১০৮. ছহীহ বুখারী হা/১২৭৮, ছহীহ মুসলিম হা/৯৩৮।

সাহাবীর সংজ্ঞা: “সাহাবী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি বিশ্বাসী অবস্থায় এর সাথে মিলিত হয়েছেন এবং এই অবস্থার উপরই মৃত্যু বরণ করেছেন।”

(৩) মাকতু': যে হাদীছ তাবেঈ বা পরবর্তী কোন ব্যক্তির দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তাকে মাকতু' হাদীছ বলা হয়।'

তাবেঈ: 'তাবেঈ ঐ ব্যক্তি যিনি রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাসী অবস্থায় সাহাবীদের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং এ অবস্থার উপরই মৃত্যু বরণ করেছেন।'

সনদের দিক দিয়ে হাদীছের প্রকারভেদ:

সনদের দিক দিয়ে খবর দু'ভাগে বিভক্ত: (১) المتواتر - (খবরে মুতাওয়াতির) (২) الأحাদ (খবরে আহাদ)।

(১) المتواتر-(খবরে মুতাওয়াতির): ঐ হাদীছকে বলে যা এতো বিপুল সংখ্যক রাবী হাদীছ বর্ণনা করেন যে, মানব প্রকৃতি স্বভাবতই তাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব মনে করবে এবং তারা এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পন্থায় বর্ণনা করবে। এর উদাহরণ হলো রসূলের বাণী:

من كذب علي متعمداً فليتبوء مقعده من النار

'যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা কথা বলে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম করে নেয়।'<sup>১০৯</sup>

(২) الأحাদ (খবরে আহাদ): মুতাওয়াতির ছাড়া বাকী সবই খবরে আহাদ।

এটি মর্যাদাগত দিক দিয়ে তিন প্রকার। যথা: ১. الصحيح (ছহীহ) ২. الحسن (হাসান) ৩. الضعيف (দঈফ)

১. الصحيح (ছহীহ): 'যে হাদীছ ন্যায়নিষ্ঠ পূর্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন এবং যা শায'<sup>১১০</sup> ও হাদীছের বিশুদ্ধতাকে নষ্টকারী গোপন সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি মুক্ত হয়।'

২. الحسن (হাসান): যে হাদীছ ‘হালকা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবী অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণনা করেন এবং যা শায় ও হাদীছের বিশুদ্ধতাকে নষ্টকারী গোপন সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়, তাকে হাসান হাদীছ বলে।’ এ ধরনের হাদীছ একাধিক সনদ থাকলে সেটি ছহীহ হাদীছের স্তরে পৌঁছে যায় এবং সেটিকে ‘ছহীহ লিগাইরিহী’ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

৩. الضعيف (দ্বঈফ): যে হাদীছের মধ্যে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ অবিদ্যমান থাকে, তাকে দ্বঈফ হাদীছ বলে। এ ধরনের হাদীছের যখন একাধিক সনদ এমন ভাবে থাকে, যার একটি অপরটির দিকে শক্তিশালী করে, তখন সেটি হাসানের স্তরে পৌঁছে যায়। এটিকে ‘হাসানে লিগাইরিহী’ বলা হয়।

দ্বঈফ হাদীছ ছাড়া বাকী সব ধরনের হাদীছই দলীল হিসাবে গণ্য। দ্বঈফ হাদীছ দলীল যোগ্য নয়। তবে সেগুলোকে অন্য হাদীছের শাহেদ (সমর্থক বর্ণনা) হিসাবে পেশ করাতে কোন দোষ নেই।

### হাদীছ বর্ণনা করার ছীগাহ বা শব্দরূপ:

হাদীছের التحمل (গ্রহণ করা) ও الأداء (বর্ণনা করা) দু’টি দিক রয়েছে।

التحمل (গ্রহণ করা): হাদীছ অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করাকে التحمل বলে।

الأداء (বর্ণনা করা): হাদীছ অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়াকে الأداء বলে।

হাদীছ অন্যের কাছে বর্ণনা করার কিছু ছীগাহ বা শব্দরূপ রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

১. حدثني (আমাকে বর্ণনা করেছেন): এটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য যাকে শাইখ নিজে হাদীছ পড়ে শুনিয়েছেন।

২. أخبرني (আমাকে বর্ণনা করেছেন): এটি ব্যবহার্য যাকে শাইখ হাদীছ পড়ে শুনিয়েছেন অথবা তিনি নিজেই হাদীছটি শাইখকে পড়ে শুনিয়েছেন (শাইখ তাতে সম্মতি দিয়েছেন)।

---

১১০. শায় হলো কোন নির্ভরযোগ্য রাবী তার চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য রাবী অথবা একাধিক নির্ভরযোগ্য রাবীর সাথে বিরোধপূর্ণ ভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন।

৩. أُخبرني إجازة ، أو أجاز لي (অনুমতি সূত্রে আমাকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন অথবা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন): এটি ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার্য যিনি শাইখ থেকে হাদীছ অনুমতি সূত্রে বর্ণনা করেন। পঠন-পাঠনের সূত্রে নয়।

الإجازة (অনুমতি): শাইখ যে হাদীছ বর্ণনা করেন, ছাত্রকে ঐ হাদীছ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদানই الإجازة। যদিও এটি পঠন-পাঠনের পন্থায় না হয়।

৪. العننة (হতে) শব্দে হাদীছ বর্ণনা করাকে العننة বলে। এ ধরনের হাদীছের হুকুম হলো মুত্তাছিল হিসাবে গণ্য হওয়া। তবে তাদলিছ করার মাধ্যমে যিনি পরিচিত তাঁর বর্ণনা ব্যতীত। এক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি বর্ণনা না করা পর্যন্ত এগুলোকে মুত্তাছিল হাদীছের হুকুম দেয়া হবে না।

হাদীস ও তার রাবী সম্পর্কে মুসতাল্লাউল হাদীছে অনেক প্রকারের আলোচনা রয়েছে। আমরা যতটুকু ইঙ্গিত করলাম, এক্ষেত্রে এতটুকুই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

## ইজমা (الإجماع)

ইজমা এর আভিধানিক অর্থ: দৃঢ় সংকল্প করা, একমত হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ:

اتفاق مجتهدى هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي

“ ইজমা হল রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশার পর শারঈ কোন হুকুমের বিষয়ে এ উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐক্যমত পোষণ করা। ”

আমাদের বক্তব্য: اتفاق (ঐক্যমত) এ শব্দ দ্বারা ‘মতানৈক্যের অস্তিত্ব বের হয়ে গেছে। যদিও মতানৈক্য একজন বিদ্বানের পক্ষ থেকে হয়। কাজেই কোন বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান থাকলে সে বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হবে না।

مجتهدى (মুজতাহিদগণ) এ শব্দ দ্বারা সাধারণ মানুষ ও মুকাল্লিদগণ বের হয়ে গেছে। কাজেই এদের একমত হওয়া বা ভিন্ন মত পোষণ করা ধর্তব্য হবে না।

هذه الأمة (এ উম্মতের) এ অংশ দ্বারা অন্য জাতির ঐক্যমত বের হয়ে গেছে। সুতরাং ভিন্ন জাতির ঐক্যমত শরীয়তে ধর্তব্য হবে না।

بعد النبي صلى الله عليه وسلم (রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশার পর) এ অংশ দ্বারা তার জীবদ্দশায় তার (ছাহাবীদের) ঐক্যমত বের হয়ে গেছে। সেগুলো স্বয়ং সম্পন্ন ভাবে দলীল হওয়ার কারণে তা ইজমা হিসাবে অভিহিত হবে না। কেননা, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও অনুমোদনের সুন্নাহ দ্বারাই দলীল অর্জিত হয়। এজন্য ছাহাবীরা যখন বলেন, আমরা রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এরূপ করতাম অথবা তারা এরূপ করতো। এগুলো বিধানগতভাবে মারফু হাদীছ; ‘ইজমার বিবরণ’ নয়।

على حكم شرعي (শারঈ কোন হুকুমের বিষয়ে) এ অংশ দ্বারা জ্ঞানগত কিংবা প্রকৃতিগত বিষয়ে ঐক্যমত বের হয়ে গেছে। এখানে এসবের কোন অনুপ্রবেশ নেই। কেননা, ‘ইজমা’ শরীয়তের একটি দলীল এখানে আলোচ্য বিষয় এটিই।



বেশ কিছু দলীলের ভিত্তিতে ইজমা প্রামাণ্য বিষয় বলে গণ্য। তন্মধ্যে অন্যতম দলীল হলো:

### ১. আল্লাহর বাণী:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

“এমনিভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা মানবমন্ডলীর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হও (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৪৩)।”

“মানুষের জন্য সাক্ষী হতে পারো” এটি মানুষের কর্মের বিধানের সাক্ষ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে সাক্ষীর কথা গ্রহণযোগ্য।

### ২. আল্লাহর বাণী:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

“অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো (সূরা আন-নিসা ৪:৫৯)।”

আয়াতটি প্রমাণ করে যেসব ব্যাপারে তাঁরা ঐক্যমত পোষণ করেন, তা হক্ব বা সত্য।

### ৩. রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

لا تجتمع امتي على الضلالة

“আমার উম্মত গোমরাহীর উপর ঐক্যমত পোষণ করবে না।”<sup>১১১</sup>

৪. আমরা বলতে পারি যে, কোন বিষয়ে এ উম্মতের ঐক্যমত পোষণ করা হয়তো হক্ব হবে, না হয় বাতিল হবে। যদি হক্ব হয় তাহলে সেটি দলীল যোগ্য। আর যদি বাতিল হয়, তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান এ উম্মত আল্লাহর নাবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি বাতিল বিষয়ের উপর ঐক্যমত পোষণ করবেন, যে বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন? এটা তো বড়ই অসম্ভব বিষয় !

১১১. আবু দাউদ হা/৪২৫৩, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫০, তিরমিযী/২১৬৭, আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী রহি. হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। (তাখরীজুস সুন্নাহ, হাদীছ নং ৮২)

## ইজমার প্রকারভেদ (أنواع الإجماع):

ইজমা দু'প্রকার। যথা:

১. القطعي (অকাট্য ইজমা)

২. الظني (প্রবল ধারণা মূলক ইজমা)

১. القطعي (অকাট্য ইজমা): যে ইজমা উম্মতের পক্ষ হতে অবধারিতভাবে সংঘটিত হওয়া জানা যায়, তাকে القطعي ইজমা বলে। যেমন: পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরজ হওয়ার উপর ইজমা, ব্যভিচার হারাম হওয়ার উপর ইজমা প্রভৃতি। এ ধরনের ইজমা সাব্যস্ত হওয়া এবং প্রমাণ্যতাকে কেউ অস্বীকার করে না। এ ইজমা বিরোধী ব্যক্তি অজ্ঞ না হলে কাফের গণ্য হবে।

২. الظني (প্রবল ধারণা মূলক ইজমা): যে ইজমা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে জানা যায়, তাকে الظني ইজমা বলে। এ ধরনের ইজমা সাব্যস্ত হওয়া সম্ভবের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে এ ব্যাপারে অধিকতর অগ্রগণ্য মত হলো শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া র. এর অভিমত। العقيدة الواسطية নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন,

الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.

“বিধিবদ্ধ ইজমা সেটাই যার উপর সালাফে সালাহীন ছিলেন। কারণ তাঁদের পরে প্রচুর পরিমাণে মতানৈক্য বৃদ্ধি পায় এবং উম্মাহ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।”<sup>১১২</sup>

তুমি জেনো রেখো, রহিত নয় এমন সুস্পষ্ট ছহীহ দলীলের বিপক্ষে এ উম্মতের ইজমা বা ঐক্যমত পোষণ করা সম্ভব নয়। কেননা, এ উম্মতের কেবল হক্কের উপরই ঐক্যমত পোষণ করতে পারে।

কাজেই যখন কোন ইজমাকে দলীলের বিরোধী মনে হবে, সেক্ষেত্রে তুমি দেখতে পাবে যে, হয়ত দলীলটি ছহীহ নয়, অথবা তা দ্ব্যর্থহীন বা সুস্পষ্ট নয় অথবা সেটি মানসুখ বা রহিত অথবা মাস'আলাটিতে মতানৈক্য রয়েছে, যা তুমি জানো না।

## ইজমা সংঘটিত হওয়ার শর্ত সমূহ (شروط الإجماع):

ইজমা সংঘটিত হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো :

১. বিশুদ্ধ পন্থায় ইজমা সাব্যস্ত হওয়া। এটি হতে পারে এভাবে যে, ইজমার বিষয়টি আলেমদের মাঝে সুপ্রসিদ্ধ থাকবে অথবা গভীর জ্ঞানের অধিকারী কোন নির্ভরযোগ্য বিদ্বান ইজমার বিষয়টি বর্ণনা করবেন।

২. তার পূর্বে স্থায়ী কোন মতভেদ থাকবে না। যদি তার পূর্বে এরূপ মতভেদ থাকে, তাহলে সে বিষয়ে ইজমা সংঘটিত হবে না। কেননা, বিদ্বানদের মৃত্যুর কারণে তাঁদের অভিমত গুলো বাতিল হয়ে যায় না। সুতরাং ইজমা পূর্বের মতভেদকে উঠিয়ে দেয় না। তবে এটি নতুন করে মতভেদ সৃষ্টি করতে বাধা দেয়। উৎস শক্তিশালী হওয়ার কারণে এ মতটিই অগ্রগণ্য অভিমত।

এ ব্যাপারে এটিও বলা হয় যে, ইজমার ক্ষেত্রে এটি শর্ত নয়। (ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্বের মতভেদ না থাকা শর্ত নয়) কাজেই একাধিক অভিমত সমূহের মাঝে দ্বিতীয় যুগে এসে যে কোন একটি মতের উপর ইজমা সংঘটিত হতে পারে। ফলে ইজমা পরবর্তীদের উপর দলীল হিসেবে গণ্য হবে।

অধিকাংশ বিদ্বানদের মতানুসারে ইজমা সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমাকারীদের যুগের পরিসমাপ্তি ঘটা শর্ত নয়। কাজেই কোন যুগের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র তাদের ঐক্যমত পোষণের মাধ্যমে ইজমা সংঘটিত হবে। পরবর্তিতে তাদের জন্য অথবা অন্যদের জন্য তার বিরুদ্ধাচারণ করা জায়েয নেই। কেননা, যেসব দীলল সমূহ ইজমার হুজ্জিয়াত বা প্রামাণ্যতার উপর প্রমাণ করে, তাতে যুগের পরিসমাপ্তির শর্তের উল্লেখ নেই। উপরন্তু এটি এ কারণে যে, ইজমা তাদের একমত হওয়ার সময়ই সংঘটিত হয়ে যায়। কাজেই পরবর্তীতে কোন জিনিস তাকে উঠিয়ে দিবে? যখন কোন মুজতাহিদ কোন কথা বলেন অথবা কোন কর্ম করেন এবং তা অন্যান্য মুজতাহিদগণের মাঝে প্রসিদ্ধ লাভ করে। তাঁরা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রত্যাখ্যান বা প্রতিবাদ করেন না। এ ব্যাপারে বলা হয় যে, এটি ইজমা হিসাবে গণ্য হবে। আবার এটাও বলা হয় যে, এটি ‘হুজ্জত বা প্রামাণ্য’ হিসাবে গণ্য হবে; ইজমা হিসাবে নয়। এটাও বলা হয় যে, এটি প্রত্যাখ্যান করার আগেই তাদের জীবন কালের পরিসমাপ্তি ঘটলে তা ইজমা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের যুগের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান না করে অব্যাহত ভাবে চূপ থাকা বিষয়টিতে তাদের সহমত পোষণ করার উপর প্রমাণ বহন করে। সুতরাং এ মতটি সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী অভিমত।

## القياس-কিয়াস

القياس এর সংজ্ঞা: القياس কিয়াস-এর আভিধানিক অর্থ হলো অনুমান করা, সমান করা। পারিভাষিক অর্থ:

تسوية فرع بأصل في حكم لعللة جامعة بينهما

“ কিয়াস হলো কোন হুকুমের ক্ষেত্রে মূল দলীলের সাথে শাখাগত দলীলকে উভয়ের মাঝে সমন্বয়কারী ইল্লাত (হুকুমের কারণ) থাকার কারণে সমান করা।”<sup>১১৩</sup>

الفرع (শাখা): الفرع দ্বারা উদ্দেশ্য যাকে কিয়াস করা হয়।

الأصل (মূল): الأصل দ্বারা উদ্দেশ্য যার উপর অন্যকে কিয়াস করা হয়।

الحكم (বিধি-বিধান): الحكم হলো শারঈ দলীল যা (বিধি-বিধান) দাবী করে।

যেমন: ওয়াজিব, হারাম, ছহীহ ও ফাসেদ প্রভৃতি।

العللة হলো: العلة হলো ঐ অন্তর্নিহিত অর্থ যার কারণে الأصل (মূল) এর হুকুম সাব্যস্ত হয়।

এ চারটি হলো কিয়াসের রুকন বা ভিত্তি। যে সব দলীলের মাধ্যমে শারঈ হুকুম সাব্যস্ত হয় তার অন্যতম হলো কিয়াস। এটি শারঈ দলীল হিসাবে গণ্য হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ছাহাবীদের বাচনিক দলীল রয়েছে।

কুরআনের দলীলের মধ্যে অন্যতম দলীল হলো:

### (১) আল্লাহর বাণী:

১১৩. যেমন: হাদীছে গোবর দিয়ে শৌচাকার্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধের কারণ বলা হয়েছে যে, এটি নাপাক। (ছহীহ বুখারী/১৫৬) এর উপর কিয়াস করে বলা হয় যে, শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচাকার্য করা নিষেধ। যে হুকুম সরাসরি দলীল দিয়ে সাব্যস্ত হয়, সেটি আসল। যাকে এ আসলের উপর কিয়াস করা হয়, তাকে শাখা বলা হয়। এখানে গোবর দিয়ে শৌচাকার্য করা নিষেধের হুকুমটি আসল। শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচাকার্য করা নিষেধের হুকুমটি শাখা। কিয়াস করার জন্য জন্য আসল ও শাখার ইল্লাত বা কারণ একই হতে হয়। এখানে গোবর দিয়ে শৌচাকার্য করতে নিষেধের কারণ হলো এগুলো নাপাক। এর ভিত্তিতে শুকনা রক্ত দিয়ে শৌচাকার্য করা নিষেধ হবে; কারণ এখানেও ঐ কারণটি পাওয়া গেছে। কেননা শুকনো রক্তও নাপাক।

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ

“আল্লাহ যিনি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি আরও অবতীর্ণ করেছেন ন্যায়দণ্ড (সূরা শুরা ৪২:১৭)।”

الْمِيزَانَ (দাঁড়িপাল্লা) হলো যার দ্বারা বিভিন্ন জিনিস ওজন করা হয় এবং সেগুলির মাঝে তুলনা করা হয়।

(২) আল্লাহর বাণী:

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ

“যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই আমি দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবো (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:২১৪)।”

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فُسْقِنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ.

“অর্থ: আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূখন্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর তদ্বারা সে ভূখন্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনভাবে হবে পুনরুত্থান (সূরা ফাতির ৩৫:৯)।”

আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টি জীবকে পুনরায় সৃষ্টি করাকে প্রথমবার সৃষ্টি করার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে জীবিত করাকে জমিন জীবিত করার সাথে সাদৃশ্য দিয়েছেন। এটিই হলো ক্বিয়াস। সুন্নাহ হতে দলীল হলো-

(১) যে মহিলা তার মা মারা যাওয়ার পর মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার জবাবে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বক্তব্য:

أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَمْكٍ دِينَ فَقَضَيْتَهُ ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَٰلِكَ عَنْهَا ؟

“ তোমার কি অভিমত, যদি তোমার মায়ের ঋণ থাকে, অতঃপর তা পরিশোধ করো, তবে কি তা আদায় হয়ে যাবে? মহিলা জবাবে বললেন, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, তাহলে তোমার মায়ের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করো।”<sup>১১৪</sup>

(২) “এক ব্যক্তি এসে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার একজন কালো সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কি উট আছে? লোকটি বললো, হ্যাঁ। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেগুলোর রং কি? লোকটি বললো, লাল বর্ণের। তিনি বললেন, সেখানে কি ছাই বর্ণের উটও আছে? লোকটি বললো, জ্বী, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এ রং কোথা থেকে আসলো? লোকটি বললো, হয়তো এটি বংশগত কারণে হয়েছে। এবার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জবাবে বললেন, তাহলে তোমার সন্তানও হয়তো বংশগত কারণে এমন হয়েছে।”<sup>১১৫</sup>

কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত এ রকম প্রতিটি দৃষ্টান্তই ক্রিয়াসের উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা, এতে কোন জিনিসকে তার সমজাতীয় জিনিসের পর্যায়ভুক্ত করার’ বিষয়টি নিহিত আছে।

ছাহাবীদের বক্তব্য থেকে অন্যতম দলীল হলো শাসন কার্য ফয়সালার ক্ষেত্রে আবু মুসা আল আশআ’রী রা. এর উদ্দেশ্যে চিঠিতে উমার রা. বলেন, “... তারপর তোমার বুঝ, যা তোমার কাছে প্রতিভাত হয়, তদানুযায়ী ফায়সালা করবে। যে মাসআ’লার ব্যাপারে কুরআন-হাদীছে কোন দলীল নেই তা তোমার কাছে পেশ করা হলে তুমি ঐ সব মাসআ’লাকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ক্রিয়াস বা পারস্পরিক তুলনা করবে এবং উপমা সম্পর্কে জ্ঞান রাখবে। তারপর তোমার ধারণানুসারে যা আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় এবং হক্কের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তার উপরই নির্ভর করবে।”<sup>১১৬</sup>

ইবনুল কাইয়ুম রা. বলেছেন, “এটি অত্যন্ত মর্যাদাবান চিঠি, যা উম্মাহ গ্রহণ করে নিয়েছেন। ইমাম মুযানী র. বলেন, ছাহাবীদের যুগ থেকে তার যুগ পর্যন্ত সকল ফকীহ একমত যে, ‘নিশ্চয় হক্কের অনুরূপ জিনিসও হক্ক এবং বাতিলের অনুরূপ জিনিসও বাতিল হিসাবে বিবেচিত’ এবং তারা ফিকুহের সকল বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াসের ব্যবহার করছেন।”<sup>১১৭</sup>

১১৫. ছহীহ বুখারী হা/৫৩০৫, ছহীহ মুসলিম হা/১৫০০।

১১৬. বাইহাকী ১০/১১৫, দারাকুত্নী ৪/২০৬-২০৭

১১৭. ইগাসাতুল লাহফান ১/৮৬

### ক্বিয়াস করার ক্ষেত্রে শর্তাবলী (شروط القياس):

ক্বিয়াসের অনেক শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) ক্বিয়াস তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী দলীলের সাথে বিরোধপূর্ণ হবে না। কাজেই যে ক্বিয়াস *نص* বা কুরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট দলীল, ইজমা ও ছাহাবীদের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। (যখন আমরা বলি যে, ছাহাবীদের বক্তব্য দলীলযোগ্য)।

সুতরাং যে ক্বিয়াস পূর্বোক্ত দলীল সমূহের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়, তাকে *فاسد الاعتبار* বা গ্রহণের অযোগ্য ক্বিয়াস হিসাবে অভিহিত করা হয়। এর দৃষ্টান্ত হলো প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে, এর উপর ক্বিয়াস করে বলা যে, প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করতে পারবে। এ ক্বিয়াসটি *نص* এর সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে *فاسد الاعتبار* বা অগ্রহণযোগ্য। রসূল *ﷺ* আল্লাহিহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, *لا نكاح الا بولي* অর্থাৎ অভিভাবক ছাড়া কোন বিবাহ নেই।<sup>১১৮</sup>

(২) মূল দলীলের হুকুমটি *نص* বা ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত হতে হবে। সুতরাং যদি মূল হুকুমটি ক্বিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়, তাহলে তার উপর অন্যকে ক্বিয়াস করা যাবে না। বরং এটিকে প্রথম মূলের উপর ক্বিয়াস করতে হবে। কেননা, সেদিকে ফিরে যাওয়াই উত্তম। কারণ যে বিষয়কে আসল নির্ধারণ করে তার উপর শাখাকে ক্বিয়াস করা হয়, অনেক সময় তা ছহীহ হয় না। এখানে আরো কারণ হলো *فرع* কে *فرع* এর উপর ক্বিয়াস করা, অতঃপর সেই *فرع* কে আবার *أصل* এর উপর ক্বিয়াস করা কোন উপকার ছাড়াই দীর্ঘসূত্রতা মাত্র।

এর দৃষ্টান্ত হলো এটা বলা যে, ভূট্টাতে সুদ প্রযোজ্য হবে চাউলের উপর ক্বিয়াস করে। চাউলে সুদ প্রযোজ্য হয় গমের উপর ক্বিয়াস করে। এভাবে ক্বিয়াস করা শুদ্ধ নয়। বরং এভাবে বলতে হবে যে, ভূট্টাতে সুদ প্রযোজ্য হবে গমের উপর ক্বিয়াস করে। এর কারণ হলো, যাতে *نص* দ্বারা সাব্যস্ত *أصل* এর উপর ক্বিয়াস করা যায়।

(৩) أصل এর হুকুম একটি জাত এলা থাকতে হবে। যাতে أصل ও فرع এর এলা এর মাঝে সমন্বয় করা যায়। যদি মূলের হুকুম কেবল ইবাদত হয়, তাহলে তার উপর অন্য কিছুকে ক্বিয়াস করা যাবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো উটের গোশতের উপর ক্বিয়াস করে এটা বলা যে, উট পাখির গোশত খেলে ওয়ু ভেঙ্গে যাবে। যেহেতু উটের সাথে উট পাখির মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে বলা হবে, এ ক্বিয়াস ছহীহ নয়। কারণ মূলের হুকুমের জাত কোন কারণ নেই।<sup>১১৯</sup> প্রসিদ্ধ মতানুসারে এটা নিরঙ্কুশ ইবাদত।

(৪) হুকুমের সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থকে ইল্লত ধরতে হবে, যার গ্রহণযোগ্যতা শরীয়তের মূলনীতি থেকে জানা যাবে। যেমন: মদ হারামের ইল্লত বা কারণ হলো মাদকতা আসা বা মাতাল হওয়া। ইল্লতের অর্থ যদি দূরবর্তী গুণকে ধারণ করে, যার সাথে হুকুমের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, তাহলে সেটিকে ইল্লত হিসাবে নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন: সাদা, কালো প্রভৃতি। এর উদাহরণ হলো আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীছ যখন বারীরাতে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়, তখন তাঁর স্বামীর ব্যাপারে তাকে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হয়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, তার স্বামী কালো দাস ছিলো। এখানে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের বক্তব্য ‘কালো’ একটি দূরবর্তী গুণ; যার সাথে ঐচ্ছিকতা প্রদানের হুকুমের সাথে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এ জন্য কোন দাসীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হলে তার স্বামী যদি দাস হয়, তবে তাকে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হবে। যদিও তার স্বামী ফর্সা হয়। অনুরূপ ভাবে স্বামী স্বাধীন থাকলে, দাসীকে স্বাধীন করার পরও তার জন্য ঐচ্ছিকতা সাব্যস্ত হবে না, যদিও তার স্বামী কালো হয়।

(৫) أصل এর ন্যায় فرع এর মাঝেও ইল্লত বিদ্যমান থাকা। যেমন: বাবা-মাকে ‘উহ্’ বলা নিষেধের উপর ক্বিয়াস করে বাবা-মাকে প্রহার করা নিষেধ করা। কেননা, উভয়ের ক্ষেত্রে কারণ হলো কষ্ট দেওয়া। কাজেই فرع এর মাঝে ইল্লত পাওয়া না গেলে ক্বিয়াস শুদ্ধ হবে না।

এর দৃষ্টান্ত হলো এরূপ বলা যে, গমের মধ্যে সুদ হারামের কারণ হলো এটি পরিমাপযোগ্য। অতঃপর এটা বলা যে, গমের উপর ক্বিয়াস করে আপেলেও সুদ

---

১১৯. হাদীছে উটের গোশত খেলে ওয়ু ভেঙ্গে যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কেন ওয়ু ভেঙ্গে যায়, এর কোন ইল্লত বা কারণ বর্ণনা করা হয়নি। যেহেতু এর কোন কারণ জানা যায় না, কাজেই এর উপর অন্যকে ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা, ক্বিয়াস করার জন্য শর্ত হলো আসলের এর হুকুমের ইল্লত জানা থাকতে হবে।



প্রযোজ্য হবে। এ ক্বিয়াস শুদ্ধ নয়। কারণ فرع এর মাঝে ইল্লত পাওয়া যায়নি। কেননা, আপেল পরিমাপযোগ্য নয়। (বরং ওয়নযোগ্য)।

### ক্বিয়াসের প্রকারভেদ (أقسام القياس):

ক্বিয়াস দু'প্রকারে বিভক্ত। যথা:

১. الجلي (সুস্পষ্ট ক্বিয়াস)।

২. الخفي (অস্পষ্ট ক্বিয়াস)।

১. الجلي (সুস্পষ্ট ক্বিয়াস) যে ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে علة (কারণ) نص (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) অথবা ইজমার মাধ্যমে জানা যায় অথবা যে ক্বিয়াসে أصل ও فرع এর মাঝে অকাট্য ভাবে পার্থক্য না থাকে, তাকে ক্বিয়াসে الجلي বা সুস্পষ্ট ক্বিয়াস বলে।

علة (কারণ) نص (কুরআন-হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য) দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো গোবর দ্বারা কুলুখ নেয়া নিষেধের উপর শুকনা-নাপাক রক্ত দ্বারা কুলুখ নেয়া নিষেধের ক্বিয়াস। কেননা, এখানে أصل এর ছকুমের ইল্লত বা কারণ নিম্নোক্ত نص দ্বারা সাব্যস্ত। نص হলো আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দু'টি পাথর ও একটি গোবর (কুলুখ নেওয়ার জন্য) এনেছিলেন। অতঃপর তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন আর গোবর ফেলে দেন এবং বলেন, এটা ركس অর্থাৎ নাপাক।<sup>১২০</sup>

ইল্লত ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারককে রাগান্বিত অবস্থায় বিচার-ফয়সালা করতে নিষেধ করেছেন।<sup>১২১</sup> রাগান্বিত ব্যক্তির বিচার-ফয়সালা করা নিষেধের উপর ক্বিয়াস করে পেশাব-পায়খানার বেগ প্রাপ্ত ব্যক্তির বিচার-ফয়সালা করা নিষেধের ক্বিয়াস, قياس جلي এর

১২০. ছহীহ বুখারী হা/১৫৬

১২১. ছহীহ বুখারী হা/৭১৫৮

অন্তর্ভুক্ত। কারণ أصل এর ইল্লাত ইজমার মাধ্যমে সাব্যস্ত। আর তা হলো অন্তর ও চিন্তার অস্থিরতা।<sup>১২২</sup>

أصل ও فرع এর মাঝে অকাট্যভাবে পার্থক্য না থাকার দৃষ্টান্ত হলো ইয়াতিমের সম্পদ খেয়ে ধ্বংস করা হারাম হওয়ার উপর কিয়াস করে তার সম্পদ ব্যবহার করে ধ্বংস করা হারাম। কারণ উভয়ের মাঝে অকাট্যভাবে কোন পার্থক্য নেই।

২. الخفي (অস্পষ্ট কিয়াস): যে কিয়াস ইল্লাত অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে হয় এবং أصل ও فرع এর মাঝে পার্থক্য না থাকার বিষয়টি অকাট্য ভাবে বলা যায় না, তাকে قياس خفي বলে। এর উদাহরণ হলো সুদ হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে গমের উপর যবক্ষার কিয়াস করা। ‘পরিমাপ যোগ্য’ হওয়ার কারণে উভয়টির সমন্বিত ইল্লাত। এখানে ‘পরিমাপ যোগ্য’ কে ইল্লাত বানানো نص বা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত নয় এবং أصل ও فرع এর মাঝে পার্থক্য না থাকার ব্যাপারে অকাট্য ভাবে বলা যায় না। কেননা, উভয়ের মাঝে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, গম খাদ্য দ্রব্য পক্ষান্তরে যবক্ষার খাদ্য দ্রব্য নয়।<sup>১২৩</sup>

قياس الشبه (সাদৃশ্যমূলক কিয়াস): কিয়াসের মাঝে আরেকটি হলো قياس الشبه। এটি হলো, যে কিয়াসের فرع ভিন্ন ভিন্ন হুকুম সম্পন্ন দুটি أصل এর মাঝে দোদুল্যমান থাকে। উভয় أصل এর সাথে উক্ত فرع এর সাদৃশ্যতা রয়েছে। তাই উক্ত فرع কে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ أصل এর সাথে যুক্ত করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো দাসকে স্বাধীন ব্যক্তির উপর কিয়াস করে কোন জিনিসের মালিক বানিয়ে দিলে সে মালিক হবে? নাকি চতুষ্পদ প্রাণীর উপর কিয়াস করে মালিক বানিয়ে দিলেও মালিক হবে না?

যখন আমরা স্বাধীন ব্যক্তি ও চতুষ্পদ জন্তু এ দু’টি أصل এর দিকে লক্ষ্য করবো, আমরা দেখতে পাবো যে, দাস শব্দটি فرع ও أصل উভয় এর মাঝে দোদুল্যমান।

১২২. রাগান্বিত অবস্থায় বিচার ফায়ছালা করা নিষেধ। কারণ এ সময় মানুষের চিন্তা-চেতনা অস্থির থাকে। এর উপর কিয়াস করে পেশাব-পায়খানার চাপ থাকা অবস্থায়ও বিচার ফায়ছালা করবে না। কেননা, এ অবস্থাতেও মানুষের চিন্তা-চেতনা অস্থির থাকে।

১২৩. الأشتان (যবক্ষার) হলো বালুময় জায়গায় উৎপন্ন এক প্রকার উদ্ভিদ, যেগুলিকে কাপড়, হাত প্রভৃতি ধোয়ার জন্য ক্ষার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

দাস জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, সে তার কর্মের শাস্তি ও ছাওয়াব পায়, সে বিবাহ করে, তালাক দেয় এ সব দিক দিয়ে স্বাধীন ব্যক্তির সাথে তার সাদৃশ্যতা রয়েছে। আবার তাকে বিক্রয় করা যায়, বন্ধক রাখা যায়, ওয়াকফ করা যায়, দান করা যায় এবং উত্তরাধিকার পণ্য বিবেচিত হয়। সে নিজে কারো ওয়ারিশ হতে পারে না, মূল্যের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়,<sup>১২৪</sup> তাকে ব্যবসার পণ্য বানানো যায়,<sup>১২৫</sup> এ সব ক্ষেত্রে সে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথে সাদৃশ্য রাখে। সুতরাং আমরা দেখতে পেলাম যে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চতুষ্পদ প্রাণীর সাথেই তার সাদৃশ্যতা বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাকে চতুষ্পদ প্রাণীর হুকুমের সাথেই যুক্ত করা হবে।

এ প্রকারের ক্বিয়াস দুর্বল। কেননা, এখানে দাসের সাথে أصل এর অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রাখা ছাড়া উপযুক্ত কোন ইল্লাত নেই। উপরন্তু ভিন্ন হুকুমের আরো একটি أصل তার সাথে সাংঘর্ষিক রয়েছে।

قياس العكس : ক্বিয়াসের মধ্যে আরো এক ধরনের ক্বিয়াস রয়েছে। যাকে قياسي العكس বা বিপরীতধর্মী ক্বিয়াস বলে। এটি হল أصل এর হুকুমের যে ইল্লাত রয়েছে, তার বিপরীত ইল্লাত فرع এর মাঝে বিদ্যমান থাকার কারণে أصل এর হুকুমের বিপরীত হুকুম فرع এর জন্য সাব্যস্ত করা।

উসুলবিদগণ রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

وفي بضع أحدكم صدقة.. قالوا يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

“স্ত্রীর সাথে তোমাদের মেলা-মেশা করাতেও তোমাদের জন্য ছাওয়াব রয়েছে। ছাহাবীরা বললেন, আমাদের কোন ব্যক্তি তার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করবে, আর তাতেও তার জন্য সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, তোমাদের কি অভিমত, যদি সে

১২৪. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন দাসকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী দাসের মালিককে দাসের মূল্য পরিশোধ করবে, যে মূল্য দিয়ে মালিক দাসটি ক্রয় করেছিলেন।

১২৫. কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করলে, হত্যার বিনিময়ে হত্যা অথবা রক্তমূল্য (একশত উটের সমপরিমাণ মূল্য) পরিশোধ করতে হবে।

অর্থাৎ তাকে বেচা-কেনা করা যায়।

এটি হারাম স্থানে ব্যবহার করতো, তবে কি তার পাপ হতো না? (নিশ্চয়ই হতো)। অনুরূপ ভাবে যখন সে এটাকে হালাল পন্থায় ব্যবহার করবে, তবে তার জন্য ছাওয়াব নির্ধারিত হবে।”<sup>১২৬</sup>

أصل এর হুকুমের ইল্লতের বিপরীত ইল্লত فرع এর মাঝে পাওয়ার কারণে فرع (অর্থাৎ বৈধ মিলন) এর জন্য أصل (অবৈধ মিলন) এর বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত করেছেন। فرع এর জন্য রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাওয়াব সাব্যস্ত করেছেন। যেহেতু এটি বৈধ মিলন। যেমনিভাবে أصل এর জন্য পাপ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটি অবৈধ মিলন।

## দলীল সমূহের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব (التعارض)।

التعارض এর আভিধানিক অর্থ: বাধা সৃষ্টি করা, পরস্পরে মুখোমুখি হওয়া।

পারিভাষিক অর্থ:

تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر .

দু'টি দলীল এমনভাবে মুখোমুখি অবস্থান করা যে, একটি অপরটির تعارض অর্থাৎ সাথে বিরোধপূর্ণ হয়।

### تعارض এর প্রকারভেদ:

প্রথম প্রকার: দু'টি عام দলীলের মাঝে تعارض এর ৪টি অবস্থা রয়েছে।

উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হবে। এটি এভাবে হবে যে, প্রত্যেকটিকে এমন অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে যে, একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এক্ষেত্রে সমন্বয় করা ওয়াজিব। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহর বাণী:

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

“নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন (সূরা আশ-শুরা ৪২:৫২)।” অপর আয়াতে তিনি বলেছেন,

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ .

“আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না” (সূরা আল-কাছাছ ২৮:৫৬)।

উভয় আয়াতের মাঝে সমন্বয় করা যায় এভাবে যে, প্রথম আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হকের পথ প্রদর্শন। এটি রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাব্যস্ত বিষয়।

দ্বিতীয় আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আমলের তাওফীক দেয়ার হিদায়াত। এটি আল্লাহর হাতে। রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কেউ এর ক্ষমতা রাখেন না।

যদি সমন্বয় করা সম্ভব না নয়, তাহলে কোন দলীল আগে এসেছে আর কোন দলীল পরে এসেছে, তার ইতিহাস জানা থাকলে পরের দলীল রহিতকারী সাব্যস্ত হবে এবং তদানুযায়ী আমল করতে হবে। প্রথমটি অনুযায়ী আমল করা হবে না। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহর বাণী:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.

“যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণ কর হয় (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৪)।”

অত্র আয়াতটি ছিয়াম পালন করা ও ছিয়াম রাখার বদলে অন্যকে খাদ্য খাওয়ানোর মাঝে ঐচ্ছিকতা প্রদান করার ফায়দা দেয়, সাথে সাথে আয়াতটির মাধ্যমে ছিয়াম পালনের দিক অগ্রাধিকার পাচ্ছে। কিন্তু পরের আয়াতে বলা হচ্ছে

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

“তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে (সূরা আল-বাক্বারা ২:১৮৫)।”

এ আয়াতটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের ছিয়াম পালন করা এবং মুসাফির ও রোগীদের ছিয়াম ক্বাজা করার বিধান নির্দিষ্ট হওয়ার ফায়দা দেয়। কিন্তু এ আয়াতটি প্রথম আয়াতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এটি পূর্বের আয়াতটিকে রহিত করে দিবে। যেমনটা প্রমাণ করে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত সালামা বিন আকওয়ার ছহীহ হাদীছ।<sup>১২৭</sup>

যদি (আগে-পরে বর্ণিত হওয়ার) ইতিহাস জানা না যায়, তাহলে অগ্রগণ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে, যদি সেখানে অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয় থাকে। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

“যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, সে যেন উষু করে।”<sup>১২৮</sup>

১২৭. ছহীহ বুখারী হা/৪৫০৭, ছহীহ মুসলিম হা/১১৪৫।

১২৮. ছহীহ: আবু দাউদ হা/১৮১, তিরমিযী হা/৮২

অপর হাদীছে রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে, তার উপর কি ওয়ু আবশ্যিক? তিনি বললেন, না। এটি তো তোমারই অঙ্গ বিশেষ।<sup>১২৯</sup>

এখানে প্রথম হাদীছটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, এটি অধিকতর সতর্কতামূলক।

এ হাদীছের সনদ সংখ্যা অনেক। একে ছহীহ আখ্যায়িতকারী মুহাদ্দিসের এর সংখ্যাও বেশি। উপরন্তু এটি أصل (উযু ওয়াজিব না হওয়া) সম্পর্কে বিবরণ। তাই এতে অতিরিক্ত ইলম রয়েছে।<sup>১৩০</sup>

যদি অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয় না পাওয়া যায়, তাহলে সেটিকে মূলতবী রাখা ওয়াজিব। আর এর বিপক্ষে কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রকার: দু'টি খাছ দলীলের মাঝে تعارض হবে। এটিরও চারটি অবস্থা রয়েছে।

১. উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে, সমন্বয় করা ওয়াজিব। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হজ্জের বিবরণ সম্পর্কে জাবের রা. এর হাদীছ। তিনি বলেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النُّحْرِ بِمَكَّةَ.

‘রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের ছলাত মক্কাতে পড়েছেন।’<sup>১৩১</sup>

অপর দিকে আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. এর হাদীছে রয়েছে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাতে যুহরের ছলাত আদায় করেছেন।<sup>১৩২</sup>

১২৯. আবু দাউদ হা/১৮২, তিরমিযী হা/৮৫, ইবনু মাজাহ হা/৪৮৩

১৩০. কোন কিছু করলে ওয়ু নষ্ট হবে না, এটাই أصل বা মূলনীতি। কাজেই যে হাদীসে বলা হচ্ছে ওয়ু করতে হবে না, সেটি মূলতঃ উক্ত সাধারণ মূলনীতির উপরই রয়েছে। পক্ষান্তরে যে হাদীছে বলা হচ্ছে উযু করতে হবে, এটি মূলতঃ উক্ত মূলনীতি সম্পর্কে অতিরিক্ত বর্ণনা দিচ্ছে। কাজেই এই হাদীসে অতিরিক্ত ইলম রয়েছে, বিধায় এটি অগ্রাধিকার পাবে।

১৩১. ছহীহ মুসলিম হা/১২১৮

১৩২. ছহীহ বুখারী হা/১৬৫৩, ছহীহ মুসলিম হা/১৩০৯

উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা হবে এভাবে যে, তিনি যোহরের ছালাত প্রথমে মক্কাতে পড়েন। এরপর যখন তিনি মিনাতে যান, সেখানকার ছাহাবীদের নিয়ে যোহরের ছালাত পুনরায় আদায় করেন।

২. যদি উভয়ের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইতিহাস জানা থাকলে দ্বিতীয়টি نسخ বা রহিতকারী সাব্যস্ত হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহর বাণী :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ...

“হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে হালাল করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার আওতাধীন করে দেন এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি আপনার চাচাতো ভগ্নি, ফুফাতো ভগ্নি, মামাতো ভগ্নি, খালাতো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫০)।”

অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ .

“এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫২)।”

এক্ষেত্রে এক মতানুসারে দ্বিতীয় আয়াতটি রহিতকারী প্রথম আয়াতকে।

(৩) যদি ‘রহিতকরণ’ সম্ভব না হয়, তাহলে অগ্রাধিকার যোগ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে, যদি সেখানে অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয় থাকে।

এর উদাহরণ হলো মাইমুনার হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছেন।<sup>১৩৩</sup>

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদীছে রয়েছে, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাইমুনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন।<sup>১৩৪</sup>

১৩৩. ছহীহ মুসলিম হা/১৪১১

১৩৪. ছহীহ বুখারী হা/৫১১৪, ছহীহ মুসলিম হা/১৪১০



এখানে প্রথম হাদীছটি অগ্রাধিকার যোগ্য। কেননা, মাইমুনাহ রা. ঘটনার সাথে সরাসরি জড়িত। কাজেই এসম্পর্কে তিনিই বেশি অবগত।

উপরন্তু তার হাদীছকে আবু রাফে বর্ণিত হাদীছ শক্তিশালী করে। হাদীছটি হলো আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়মুনাকে রা. হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। আর আমি উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ছিলাম।<sup>১৩৫</sup>

(৪) যদি (কোন একটি দলীলকে) অগ্রাধিকার দান করে এমন কোন বিষয় না থাকে, তবে উভয় দলীল মূলতবী রাখা ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার: عام ও خاص দলীলের মাঝে تعارض হবে। এক্ষেত্রে عام দ্বারা عام কে خاص বা বিশেষায়িত করা হবে। এর উদাহরণ হলো রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ

‘বৃষ্টির পানি দ্বারা যা উৎপন্ন হয়, তাতে এক দশমাংশ উশর দিতে হবে।’<sup>১৩৬</sup> অপর হাদীছে রয়েছে রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অপর বাণী:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“পাঁচ ওয়াসাকের কম ফসলে কোন উশর নেই।”<sup>১৩৭</sup>

এখানে দ্বিতীয় দলীল দ্বারা প্রথমটাকে خاص করা হবে। কাজেই পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ সম্পদ না পৌঁছলে তাতে যাকাত ফরয হবে না।

চতুর্থ প্রকার: এমন দুটি نص এর মাঝে تعارض হবে; যার একটি অপরটি থেকে একদিক দিয়ে অধিকতর عام আবার অপর দিক দিয়ে অধিকতর خاص। এর তিনটি অবস্থা:

১৩৫. ইবনু হিব্বান হা/১২৭২, তিরমিযী হা/৮৪১, যঈফ আলবানী।

১৩৬. ছহীহ বুখারী/১৪৮৩।

১৩৭. ছহীহ বুখারী/১৪৮৪, ছহীহ মুসলিম /৯৭৯। উল্লেখ্য যে, এই সম্পর্কে আলোচনা خاص অধ্যায়ে চলে গিয়েছে।

(১) একটির عام কে অপরটি দ্বারা خاص করার মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠিত হলে, তা দ্বারা خاص করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহর বাণী:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যু বরণ করবে এবং নিজেদের স্ত্রীদেরকে ছেড়ে যাবে, তখন ঐ স্ত্রীদের কর্তব্য হলো নিজেকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়ে রাখা (সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৩৪)।” অপর আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

“গর্ভবতী নারীদের ইন্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত (সূরা আত-ত্বালাফ ৬৫:৪)।”

প্রথম আয়াতটি ঐ মহিলার সাথে عام যার স্বামী মারা গিয়েছে। গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার দিক দিয়ে عام। আবার দ্বিতীয় আয়াতটি গর্ভবতী মহিলার জন্য عام, তবে স্বামী মারা যাওয়া বা না যাওয়া এ দিক দিয়ে عام। কিন্তু প্রথম আয়াতের عام কে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা عام করার মর্মে দলীল রয়েছে।

দলীল হলো সাবিয়া আল আসলামী নান্নী মহিলা ছাহাবীর স্বামী মারা যাওয়ার কয়েক রাত্র পর সন্তান প্রসব করেন। অতঃপর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিবাহ করার অনুমতি দেন।<sup>১৩৮</sup>

সুতরাং এ ভিত্তিতে গর্ভবতী মহিলার ইন্দতের সময়সীমা হলো, সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। চাই তার স্বামী মৃত্যু বরণ করুক অথবা বেঁচে থাক।

(২) যদি একটি عام কে অপরটি দ্বারা عام করার মর্মে কোন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে উভয়ের মাঝে অগ্রাধিকারযোগ্য দলীল অনুসারে আমল করা হবে। এর দৃষ্টান্ত হলো রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী:

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

“যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন দু’রাকাত আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে।”<sup>১৩৯</sup> অপর হাদীছে তিনি বলেন,

لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

“ফযরের ছলাতের পর কোন ছলাত নেই যতক্ষণ না সূর্যোদয় হয়। আছরের পরও কোন ছলাত নেই, যতক্ষণ না সূর্যাস্ত যায়।”<sup>১৪০</sup>

প্রথম হাদীছটি তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছলাতের সাথে خاص এবং সময়ের ক্ষেত্রে عام। অপর দিকে দ্বিতীয় হাদীছটি সময়ের ক্ষেত্রে خاص কিন্তু ছলাতের ক্ষেত্রে عام যা তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছলাত ও অন্যান্য সব ছলাতকে অন্তর্ভুক্ত করে।<sup>১৪১</sup>

কিন্তু অগ্রগণ্য মত হলো, দ্বিতীয় হাদীছের عام কে প্রথম হাদীছ দ্বারা خاص করা। সুতরাং নিষিদ্ধ সময়ের عام ছলাত থেকে خاص করে তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছলাত আদায় করা জায়েয হবে।

আমরা এ মতটিকে অগ্রাধিকার দিলাম। কেননা, তাহিয়্যাতুল মসজিদের ছলাত ছাড়াও অন্য ছলাতের মাধ্যমে দ্বিতীয় হাদীছের عام কে خاص করা প্রমাণিত হয়েছে। যেমন: ফরয ছলাত ক্বাযা করা, পুনরায় জামা‘আত করা প্রভৃতি। সুতরাং এর عامية টি দুর্বল বলে গণ্য।<sup>১৪২</sup>

১৩৯. ছহীহ বুখারী হা/৪৪৪, ছহীহ মুসলিম হা/৭১৪

১৪০. ছহীহ বুখারী হা/৫৮৬, ছহীহ মুসলিম হা/৮২৭

১৪১. অর্থাৎ প্রথম হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু‘রাক‘আত ছলাত মসজিদে প্রবেশ করলেই আদায় করতে হবে, তা যে সময়েই প্রবেশ করুক না কেন। কিন্তু দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ফযরের পর ছলাত আদায় নিষেধ, তা যে ছলাতই হোক না কেন।

১৪২. অর্থাৎ দ্বিতীয় হাদীছের عام দুর্বল। কেননা, এ হাদীছের عام এর দাবি অনুযায়ী যে কোন ছলাত আদায় করা নিষিদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু ফজর ও আছরের পর ক্বাযা ছলাত আদায় যায়, দ্বিতীয় জামা‘আত করা যায়। সুতরাং এর عام এর দাবি দুর্বল বলে গণ্য। তাই যেহেতু এর عام টি বহাল থাকে নি, সুতরাং এর عام কে অন্য হাদীছ দ্বারা خاص করারও অবকাশ রয়েছে। কেননা, কোন عام কে যখন خاص করা হয়, তখন এ ব্যাপারে কিছু বিধান বলেছেন, ঐ عام আর عام থাকে না। কিন্তু গ্রহণযোগ্য মত হলো عام দলীল যখন অন্য দলীলের মাধ্যমে خاص হয়, তখন করার পর অবশিষ্ট عام বহাল থাকবে। সমূলে বাদ হয়ে যাবে না। সুতরাং যে ছলাত কোন কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেই কারণ গুলি যখনই পাওয়া যাবে, তখনই ছলাত আদায় করা যাবে এবং এগুলি দ্বিতীয় হাদীছের عام কে خاص করে দিবে। বাকী অন্যান্য সাধারণ নফল দ্বিতীয় হাদীসের عام নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে নিষিদ্ধ গণ্য হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

(৪) যদি (একটি عام কে অপরটি দ্বারা خاص করার মর্মে কোন) দলীল প্রতিষ্ঠিত না থাকে এবং একটি عام কে অপরটি দ্বারা خاص করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দানকারী কোন বিষয়ও যদি না থাকে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই বলে ধরা হবে, এ অবস্থায় উভয় দলীল অনুযায়ী আমল করা হবে এবং যে ক্ষেত্রে উভয় দলীল বিরোধপূর্ণ, ঐ অবস্থায় আমল করা স্থগিত রাখা হবে।

কিন্তু সত্ত্বাগতভাবে نص সমূহের মাঝে এ ধরনের تعارض হওয়া সম্ভব নয় যে, তাতে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না, রহিত করাও হবে না এবং একটিকে অগ্রাধিকার দেয়াও সম্ভব হবে না। কেননা, نص সমূহ মূলতঃ পরস্পর বিরোধপূর্ণ নয়। রসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রচার করে গিয়েছেন। তবে জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মুজতাহিদদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অনেক সময় এ ধরনের تعارض সংঘটিত হয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

## অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে দলীল সমূহের মাঝে স্তর বিন্যাস (الترتيب بين الأدلة)

কোন হুকুমের ব্যাপারে যখন পূর্বোক্ত দলীল সমূহ (কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ক্বিয়াস) এক সাথে আসে অথবা তাদের মধ্যে যে কোন একটি দলীল আসে এবং তার বিরোধী কোন দলীল না আসে, তাহলে সেই হুকুম সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর যদি দলীল গুলো পরস্পরে বিরোধপূর্ণ হয়, তবে তাদের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হয়, সমন্বয় করা আবশ্যিক। সমন্বয় করা সম্ভব না হলে, ‘রহিতকরণ’ এর মাধ্যমে আমল করা হবে। যদি তার শর্তসমূহ পরিপূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়।

‘রহিতকরণ’ সাব্যস্ত করা সম্ভব না হলে, এর কোন একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেয়া আবশ্যিক হবে। এক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর-

مفهوم কে (বাচনিক) منطوق এর উপর, مؤول কে ظاهر এর উপর, نص (বোধগম্যতা) এর উপর, مثبت (হ্যাঁ বাচক) কে نافي (না বাচক) এর উপর, أصل সম্পর্কে বর্ণনা দানকারী যা أصل এর উপর বহাল রয়েছে- তার উপর, সংরক্ষিত عام কে (যে عام কে কোন ভাবেই خاص করা হয়নি) অসংরক্ষিত عام কে অন্য কোন ভাবে خاص করা হয়েছে) এর উপর,

যার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বেশি রয়েছে, তাকে কম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উপর, ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বর্ণনাকে যিনি ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট নন, তার বর্ণনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ক্বিয়াসের মধ্যে قياس خفي এর উপর, ইজমার মধ্যে قطعي ইজমাকে قياس جلي এর উপর, ইজমার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

## ফাতাওয়া দানকারী-মুফতী ও ফাতাওয়া প্রার্থী প্রসঙ্গে (المفتي والمستفتي)

المفتي (ফাতাওয়া দানকারী): মুফতি হলেন শরীয়তের কোন হুকুম সম্পর্কে সংবাদ দানকারী।

المستفتي (ফাতাওয়া প্রার্থী): শরীয়তের কোন হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তিকে المستفتي (ফাতাওয়া প্রার্থী) বলে।

### ফাতাওয়ার শর্তাবলী (شروط الفتوى):

ফাতাওয়া প্রদান জায়েয হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো-

(১) মুফতিকে শারঈ হুকুমটি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত থাকতে হবে। অথবা অগ্রাধিকার যোগ্য প্রবল ধারণা থাকতে হবে। অন্যথায় তার জন্য আবশ্যিক হলো ফাতাওয়া প্রদান স্থগিত রাখা।

(২) প্রশ্নটি নিয়ে পরিপূর্ণভাবে চিন্তা করে দেখা, যাতে করে তিনি ঐ ব্যাপারে শারঈ হুকুম বলতে সমর্থ হন। কেননা, কোন কিছু সম্পর্কে হুকুম দেয়া বিষয়টি ভালো-ভাবে বুঝার অংশ বিশেষ।

ফাতাওয়া প্রার্থীর কথার অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে, তাকে জিজ্ঞাসা করে নিবেন। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা জেনে নিবেন অথবা বিস্তারিত জবাব দিবেন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি কন্যা, ভাই ও আপন চাচা রেখে মারা গেছেন। এক্ষেত্রে মুফতি জিজ্ঞেস করে নিবেন ভাই সম্পর্কে যে, ভাই বৈপিত্রিয় কি না? অথবা বিস্তারিত জবাব দিবেন। তা এভাবে যে, ভাই যদি বৈপিত্রিয় হয়, তাহলে উত্তরাধিকার সম্পদে তার কোন অংশ নেই। কন্যার নির্ধারিত অংশ (সম্পদের অর্ধাংশ) দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ চাচার জন্য হবে। আর ভাই যদি বৈপিত্রিয় না হয় (বরং বৈমাত্রেয় বা সহদর হয়) তাহলে কন্যার নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর বাকী সম্পদ ভাই পাবে এবং চাচা কোন অংশ পাবে না।

(৩) মুফতিকে শান্ত থাকতে হবে। যাতে মাসআলাটি অনুধাবন করে শারঈ দলীলের সাথে সমন্বয় করতে পারেন। তাই রাগ, দুশ্চিন্তা, বিরক্তি প্রভৃতি কারণে চিন্তাগত অস্থির অবস্থায় ফাতাওয়া প্রদান করবেন না। ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো-

(ক) জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বাস্তবতা থাকা। তাই যদি জিজ্ঞাসিত বিষয়টির বাস্তবতা না থাকে, তাহলে প্রয়োজন না থাকার কারণে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে না। তবে যদি প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য শিক্ষা লাভ করা হয়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে। কেননা, জ্ঞান গোপন করা জায়েয নেই। বরং সর্বাবস্থায় যখনই প্রশ্ন করা হবে তখনই উত্তর প্রদান করবেন।

(খ) প্রশ্নকারীর এ রকম অবস্থা না জানা যে, তার উদ্দেশ্য হলো, একগুয়েমী করা অথবা সুযোগ সন্ধান করা অথবা আলোমদের মতামতকে পরস্পরের বিপক্ষে পেশ করা প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্য। যদি প্রশ্নকারীর অবস্থা এরূপ জানা যায়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান করা ওয়াজিব হবে না।

(গ) ফাতাওয়া প্রদানের ফলে তুলনামূলক বেশি ক্ষতিকর জিনিস সাব্যস্ত হবে না। যদি এ ধরনের অবস্থা হয়, তাহলে ফাতাওয়া প্রদান থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক। যাতে অল্প ক্ষতিকর জিনিসের মাধ্যমে অধিক ক্ষতিকর জিনিস প্রতিহত হয়।

### ফাতাওয়া প্রার্থীর জন্য যা আবশ্যিক (يلزم المستفتي أمران):

ফাতাওয়া প্রার্থীর জন্য বেশ কিছু জিনিস আবশ্যিক। যথা:

প্রথম: ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হবে হক্‌ জানা ও তদনুযায়ী অমল করা। সুযোগ সন্ধান ও মুফতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করা প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্যে নয়।

দ্বিতীয়: যিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় জানেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকেই কেবল ফাতাওয়া গ্রহণ করতে হবে অথবা যার ব্যাপারে প্রবল ধারণা আছে যে, তিনি জ্ঞানগত দিক থেকে ও আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক নির্ভরযোগ্য মুফতি, ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্য তাহলে তার নিকট থেকেই ফাতাওয়া গ্রহণ করা উচিত হবে। কেউ কেউ এভাবে বেঁছে নেয়াকে আবশ্যিক বলেছেন।

তৃতীয়: তিনি প্রশ্নকারীর অবস্থা বাস্তবতার আলোকে সুস্পষ্টভাবে বিবরণ দিবেন। যেমন: প্রশ্নকারী এভাবে বলবে যে, আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি। আমরা সাথে অল্প কিছু পানি বহন করে নিয়ে যাই তা দিয়ে ওয়ু করলে আমরা পিপাসিত হই। এমতাবস্থায় আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওয়ু করতে পারবো?

চতুর্থ: মুফতি জবাবে যা বলবেন, প্রশ্নকারী তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। এমনকি জবাব পরিপূর্ণভাবে না বুঝে চলে যাবেন না।

## ইজতেহাদ-الاجتهاد

اجتهاد এর সংজ্ঞা: اجتهاد এর আভিধানিক অর্থ: কষ্টকর কোন কিছু পাওয়ার জন্য চেষ্টা নিয়োজিত থাকা। পারিভাষিক অর্থ:

بذل الجهد لإدراك حكم شرعي

“শারঈ কোন হুকুম জানার জন্য চেষ্টা নিয়োজিত থাকাকে ইজতেহাদ বলে।” যিনি এ ধরনের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকেন, তাকে মুজতাহিদ বলে।

### ইজতিহাদ করার শর্তাবলী (شروط الاجتهاد):

ইজতিহাদ করার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে।

(১) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শারঈ জ্ঞান জানা। যেমন: বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াত ও হাদীছ সমূহ জানা।

(২) হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান জানা থাকা। যেমন: সনদ, রিজাল প্রভৃতি সম্পর্কে জানা।

(৩) নাসেখ, মানসুখ ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার স্থান সম্পর্কে জানা। যাতে করে ইজমা বিরোধী অথবা মানসুখ দলীল অনুযায়ী কোন হুকুম না দেন।

(৪) যে সব দলীলের মাধ্যমে হুকুম ভিন্ন হয়ে যায়, তা জানা। যেমন: خاص করা। শর্তযুক্ত করা প্রভৃতি। যাতে করে এদের দাবি বিরোধী কোন হুকুম না দেন।

(৫) অভিধান ও উসুলে ফিকুহের মধ্যে যেগুলি শব্দের মর্মার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট তা জানা থাকা। যেমন: مطلق، مقيد، محمول، مبین خاص، عام প্রভৃতি। যাতে এদের মর্মার্থের দাবি অনুসারে হুকুম দিতে পারেন।

(৬) দলীল থেকে বিধি-বিধান বের করার যোগ্যতা থাকা।

ইজতিহাদ খণ্ডিত হয়। তাই ইজতিহাদ ইলমের যে কোন একটি অধ্যায় কিংবা যে কোন একটি মাসআলায় হতে পারে।<sup>১৪৩</sup>

---

১৪৩ যদি কোন ব্যক্তির শরীয়াতের সামগ্রিক জ্ঞান না থাকে, কিন্তু কোন একটি মাসআলায় তার ভালো দখল থাকে, মাসআলা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দলীল-প্রমাণাদি তার কাছে থাকে তবে সে ব্যক্তি উক্ত বিষয়ে ইজতেহাদ করার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।



### মুজতাহিদের জন্য যা আবশ্যিক (ما يلزم المجتهد):

মুজতাহিদের জন্য আবশ্যিক হলো, হক্ব জানার ক্ষেত্রে তার সর্বাত্রিক চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। তার কাছে যা সত্যরূপে প্রতীয়মান হবে, তদনুযায়ী তিনি হকুম দিবেন। এতে যদি তিনি সঠিকতায় পৌঁছেন, তাহলে তার জন্য দু'টি ছওয়াব রয়েছে। একটি ছওয়াব চেষ্টা করার কারণে আরেকটি ছওয়াব হক্ব পাওয়ার কারণে। কেননা, হক্ব প্রাপ্তির মাঝে রয়েছে হক্বকে প্রকাশ করা ও তদনুযায়ী আমল করা। আর যদি তিনি ভুল করেন, তবুও তার জন্য একটি ছওয়াব রয়েছে এবং ভুলটি ক্ষমার যোগ্য বিবেচিত হবে।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

إذا حكم الحاكم فاجتهد. ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

“যখন কোন বিচারক ইজতেহাদ করে ফায়ছালা দেয়। অতঃপর তিনি ফায়ছালায় সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তার জন্য দু'টি ছওয়াব রয়েছে। আর ইজতেহাদ করার পরও ভুল করলে তবুও তার জন্য একটি ছওয়াব রয়েছে।”<sup>১৪৪</sup>

যদি তার নিকট সত্য স্পষ্ট না হয়, তাহলে তার জন্য আবশ্যিক হলো এ ব্যাপারে ইজতেহাদ স্থগিত রাখা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্যের তাক্বলীদ করাও তার জন্য বিধেয় হবে।

### তাক্বলীদ (التقليد)

التقليد এর সংজ্ঞা: التقليد এর আভিধানিক অর্থ- ঘাড়ে কোন কিছু বেঁটন করে দেয়া। যেমন: মালা। পরিভাষায়:

اتباع من ليس قوله حجة

“যার কথা শরীয়াতে হুজ্জত বা দলীল নয়, তাকে অনুসরণ করাকে তাক্বলীদ বলে।”

সুতরাং আমাদের বক্তব্য: من ليس قوله حجة (যার কথা শরীয়াতে হুজ্জত বা দলীল নয়) এ অংশ দ্বারা তাক্বলীদ বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম, ইজমাকারী, মুজতাহিদ ও ছাহাবীদের অনুসরণ ও তাদের কথা দলীল হিসাবে গণ্য হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত কারো অনুসরণকেই তাক্বলীদ হিসাবে অভিহিত করা হবে না। কেননা, এটা দলীলের অনুসরণ। তবে কোন কোন সময় রূপকভাবে এবং ব্যাপকতার দিক বিবেচনা করে এদের অনুসরণকেও তাক্বলীদ হিসাবে অভিহিত করা হয়।

### (مواضع التقلید) তাক্বলীদ করার ক্ষেত্রসমূহ:

দু'ক্ষেত্রে তাক্বলীদ করা হয়-

প্রথম: মুকাল্লিদ ব্যক্তি একেবারেই সাধারণ মানুষ, যিনি নিজে নিজে শারঈ হুকুম জানতে পারেন না। সুতরাং তার জন্য আবশ্যিক হলো তাক্বলীদ করা। আল্লাহ বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও (সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩)।”

এব্যাপারে তিনি ইলম ও আল্লাহভীরুতার দিক দিয়ে যাকে শ্রেষ্ঠ পাবেন, তার অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে যদি দু'জন ব্যক্তি সমপর্যায়ের হয়, তাহলে তাদের যে কারো অনুসরণ করার মাঝে তার স্বাধীনতা থাকবে।

দ্বিতীয়: মুজতাহিদের নিকট এমন কিছু ঘটবে, যা তাৎক্ষণিকভাবে সমাধানযোগ্য। এ ক্ষেত্রে যখন তার চিন্তা-ভাবনার অবকাশ থাকে না। এ অবস্থায় অন্যের তাক্বলীদ করা বিধেয় হবে।

তাক্বলীদ জায়েয হওয়ার জন্য কেউ কেউ এটাও শর্ত করেছেন যে, বিষয়টি দীনের এমন মৌলিক বিষয় হবে না, যা বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কেননা, আক্বীদাগত বিষয়সমূহের ব্যাপারে ব্যক্তিকে দৃঢ় বিশ্বাসী হতে হয়। অথচ তাক্বলীদ শুধুমাত্র প্রবল ধারণার উপকারে আসে। কিন্তু অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত হলো, এটা শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও (সূরা আন-নাহল ১৬:৪৩)।”

আয়াতটি রিসালাতকে সাব্যস্ত করার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ রিসালাত দীনের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু সাধারণ মানুষ দলীলের মাধ্যমে হক্ব জানতে সক্ষম হয় না। তাই যখন নিজে নিজে হক্ব জানা অসম্ভব হবে, তখন তাক্বলীদ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আল্লাহর বাণী:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“তোমরা তোমাদের সাধ্য অনুসারে আল্লাহকে ভয় করো (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬)।”

### তাক্বলীদের প্রকারভেদ (أنواع التقلید):

তাক্বলীদ দু'প্রকার:

১. العام (ব্যাপক তাক্বলীদ) ২. الخاص (নির্দিষ্ট তাক্বলীদ)

(ক) العام (ব্যাপক তাক্বলীদ): তাক্বলীদে ‘আম বা ব্যাপক তাক্বলীদ হলো, নির্দিষ্ট একটি মাযহাবকে আঁকড়ে ধরা, দীনের সব বিষয়ে মুকাল্লিদ উক্ত মাযহাবের রুখসাত (নমনীয়-সাধারণ) ও আযীমাত (শরীয়াতের আবশ্যিক) গুলো গ্রহণ করে।<sup>১৪৫</sup>

এ তাক্বলীদের ব্যাপারে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। পরবর্তী লোকদের দ্বারা ইজতিহাদ করা সম্ভবপর না হবার কারণে কেউ কেউ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন।<sup>১৪৬</sup> আবার কতিপয় বিদ্বান এটাকে হারাম বলেছেন -যেহেতু এতে রসূল ছাওয়াল্লাহু

১৪৫. রুখসাত হলো ছাড়মূলক ফাতাওয়া। যেমন: হানারী মাযহাব মতে, উটের গোশত খেলে ওয়ু করা লাগে না। আযিমাত হলো আবশ্যিক পালনীয় বিষয়। যেমন: হাম্বলী মাযহাব মতে, উটের গোশত খেলে ওয়ু ভেঙ্গে যায়। পরে ছালাত আদায় করতে চাইলে নতুন করে ওয়ু করা আবশ্যিক হয়। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি তার অনুসরণীয় মাযহাবের সব রুখসাত ও আযীমাত গ্রহণ করে।

১৪৬. এটা খুবই বাজে মত। কেননা, কুরআন-হাদীছের নছ বহাল থাকার পরেও, পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে তাক্বলীদ অবধারিত করে দেয়া মোটেও সঠিক কথা নয়।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যের অনুসরণের ক্ষেত্রে শর্তহীন বাধ্য-বাধকতা রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহি. বলেছেন,

"إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيهِ، وهو خلاف  
الاجماع وجوازه فيه ما فيه..."

“আল্লাহর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কারো আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা আবশ্যিকতার মতটি ইজমা বিরোধী। এটি জায়েয হওয়ার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।”<sup>১৪৭</sup>

তিনি আরো বলেছেন, “যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আঁকড়ে ধরে, অতঃপর উক্ত মাযহাবের বিপরীত কোন আমল করে, কোন কারণ ছাড়াই অন্য কোন আলিমের ফাতাওয়ার কারণে ঐ মাযহাবের অনুসরণ করেছে এমন নয়, মাযহাবের বিপরীত আমলের দাবি রাখে এমন কোন দলীলও তার কাছে নেই অথবা তার কর্মের বৈধতা দাবি করে এমন কোন শারঈ ওজরও নেই, তবে সে ব্যক্তি শারঈ কোন ওজর ছাড়াই হারাম সম্পাদনকারী ও তার প্রবৃত্তির পূজারী হিসাবে বিবেচিত হবে। এটি অবশ্যই গর্হিত কর্ম।

কিন্তু যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যায় এমন বিষয়, যা এক মতের উপর আরেক মতকে অগ্রাধিকার দেয়াকে অবধারিত করে, এটি হতে পারে বিস্তারিত দলীল প্রমাণের মাধ্যমে, যদি সে উক্ত দলীল-প্রমাণ জানতে ও বুঝতে পারে অথবা দু’জনের মধ্যে একজনকে উক্ত মাসআ’লার বিষয়ে অধিক জ্ঞাত মনে করে এবং সে ব্যক্তি তার বক্তব্যের ব্যাপারে আল্লাহকে অধিক ভয় করে, এমতাবস্থায় সে যদি এক অভিমত থেকে অন্য অভিমতের দিকে ফিরে যায়, তবে এটি জায়েয। বরং ওয়াজিব। এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সুস্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন।”<sup>১৪৮</sup>

২. الخاص (নির্দিষ্ট তাক্বলীদ): নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করাকে তাক্বলীদে خاص বলে। যখন কোন ব্যক্তি ইজতিহাদের মাধ্যমে হক্

১৪৭. ফাতাওয়া আল কুবরা ৪/৬২৫

১৪৮. শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহি. এর বক্তব্য অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এ জন্য বলা হয় যে, শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহি. এর কথায় সব সময় নূর থাকে। যদি মুকাদ্দিদ ভাইয়েরা এমন ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করতো, তবে মুসলিম উম্মাহ মাযহাবীয় গোঁড়ামী ও অনেক অনেক বিবাদ-বিতর্ক থেকে রক্ষা পেতো। আল্লাহর কাছেই তাওফীক চাচ্ছি।

জানতে অপারগ হবে, তখন এটি জায়েয। চাই সে ইজতেহাদ করতে প্রকৃত অর্থেই অপারগ হোক অথবা খুব কষ্ট করে ইজতিহাদ করতে সক্ষম হোক।

### মুকাব্বিদের ফাতাওয়া (فتوى المقلد):

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: من الآية 43]

“যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও।” সূরা নাহল ১৬:৪৩

এখানে أَهْلَ الذِّكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো أَهْلُ الْعِلْم বা বিদ্বান। আর মুকাব্বিদ أَهْلُ الْعِلْم বা বিদ্বান নয়। বরং সে নিজেই অন্যের অনুগামী।

আবু উমার বিন আব্দুল বার ও অন্যান্য বিদ্বান বলেছেন,

أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمُقْلِدَ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَنَّ الْعِلْمَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ بِدَلِيلِهِ

“সমস্ত মানুষ একমত যে, মুকাব্বিদ أَهْلُ الْعِلْم দের পর্যায়াভুক্ত নয়। অথচ علم হলো দলীলসহ হক্ক জানা।”

ইবনুল কাইয়ুম রহি. তেমনই বলেছেন, যেমনটা আবু আমর বলেছেন, নিশ্চয় বিষয়টি মূলতঃ তেমনই। কেননা, বিদ্বানগণের মাঝে এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, ইলম হলো দলীল থেকে অর্জিত জ্ঞান। পক্ষান্তরে দলীল ছাড়া জ্ঞান হলো তাক্বলীদ।

তারপর ইবনুল কাইয়ুম রহি. তাক্বলীদের মাধ্যমে ফাতাওয়া দেয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম: তাক্বলীদের মাধ্যমে ফাতাওয়া দেয়া জায়েয নেই। কেননা, তাক্বলীদ কোন ইলম নয়। আর ইলম ছাড়া ফাতাওয়া দেয়া হারাম। এটিই হলো অধিকাংশ হাম্বলী অনুসারী ও অধিকাংশ শাফেয়ীদের অভিমত।

দ্বিতীয়: এটি নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জায়েয। আর যে বিষয়ে সে নিজেই অন্যকে ফাতাওয়া দেয়, সে বিষয়ে তার জন্য অন্যের তাক্বলীদ করা জায়েয নেই।

তৃতীয়: প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং মুজতাহিদ আলিমের অনুপস্থিতির কারণে তা জায়েয। এটিই হলো অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত এবং এর উপর বিদ্বানদের আমল রয়েছে।<sup>১৪৯</sup> এখানে তার কথা সমাপ্ত হলো।

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা যা লিখতে চেয়েছিলাম, তা এর মাধ্যমেই পরিসমাপ্তি ঘটছে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদের কথা ও কাজে ‘সঠিকতা’ ঢেলে দেন, আমাদের কর্মগুলোকে সফলতার মুকুট পরিয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি দানশীল, মহানুভব। আল্লাহ তা’য়ালার রহমত ও শান্তির ধারা বর্ষণ করুন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ও তার পরিবার পরিজনের প্রতি।

### গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কামুসুল মুহীত: ফীরোযাবাদী
২. আল কাওকাবুল মুনীর শারহ মুখতাসারত তাহরীর: আল ফাভুহী
৩. মিনহাজুল উসূল ওয়া শারহ: মতন বা মূলভাষ্য ইমাম বাইযাবীর র: কিন্তু এর ব্যাখ্যাকারী অজ্ঞাত।
৪. শারহ জামউল জাওয়ামি‘ ওয়া হাশিয়াতুহ: ব্যাখ্যা ইমাম মুহাল্লা, টিকাকার বান্নানী
৫. রওয়াতুন নাযের ওয়া শারহ: মূল কিতাব মুওফেফক এর, ব্যাখ্যাকার আব্দুল কাদের বাদরান
৬. হুসূলুল মা‘মূল মিন শারহিল উসূল: মুহাম্মাদ সিদ্দীক
৭. আল মাদখাল ইলা মাযহাবে আহমাদ বিন হাম্বাল: আব্দুল কাদির বিন বাদরান
৮. ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহক্বীক্বিল হাক্বি মিন ইলমিল উসূল: ইমাম শাওকানী
৯. ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহি:) : সংকলক আব্দুর রহমান বিন কাসেম
১০. আল মুসওয়াদাহ ফি উসুলিল ফিকহ: শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, তার বাবা ও দাদা।
১১. যাদুল মা‘আদ : ইবনুল কাইয়িম (রহি:)
১২. ই‘লামুল মুওয়াক্কিঈন: ইবনুল কায়িম (রহি:)

## মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত/অপ্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ  
-শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. কালিমা শাহাদাত- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি  
-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল
৪. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৫. আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন (প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)  
-ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৬. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৭. কিতাবুত তাওহীদ-ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৮. আক্বীদাতুত তাওহীদ (তাওহীদি বিশ্বাস ও তার পরিপন্থী বিষয়)  
-ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
৯. ছহীহ আক্বীদার দিশারী - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১০. আল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
১১. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১২. শারহু মাসা‘ইলিল জাহিলিয়াহ - ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১৩. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ -বন্ধুত্ব ও শত্রুতা  
- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১৪. মানহাজ (কর্মপদ্ধতি)- ড. ছলিহ ইবনে ফাওয়ান আল ফাওয়ান
১৫. আল-আক্বীদা আত-ত্বাহাবীয়া- ইমাম আবু জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বাহাবী
১৬. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবীয়া প্রথম খণ্ড - ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী
১৭. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড - ইবনে আবীল ইয় আল-হানাফী
১৮. আল ওয়াছাইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া
১৯. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
২০. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
২১. কাবীরা গুনাহ (সংক্ষিপ্ত) -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী
২২. খিলাফাত ও বাই‘আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন
২৪. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন
২৫. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন
২৬. উসূলে ফিক্‌হ-ফিক্‌হের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছলিহ আল উছাইমীন
২৭. উসূলে হাদীছ-হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন আছারী
২৮. ক্রিয়ামতের ছহীহ আলামত- শাইখ 'ইছাম মুসা হাদী
২৯. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
৩০. দল/সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য  
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
৩১. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)- সংকলনে সাজ্জাদ সালাদীন
৩২. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন -সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন
৩৩. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকা- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৩৪. সিয়াম ও রমাদান- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৩৫. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৩৬. যাকাত ও দান-খয়রাত- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন
৩৭. তাইসীরুল 'আল্লাম শারহ্ উমদাতিল আহকাম- আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ আল বাস্‌সাম